শরীর ভাল রাখতে হলে

শরীর ভাল রাখতে হলে

অশোককুমার সেনগুপ্ত

ও রি য়ে ণ্ট লং ম্যা ন্স
কলিকাতা ✲ বোম্বাই ✲ মাদ্রাজ

ওরিয়েন্ট লংম্যান্স প্রাইভেট লিমিটেড
১৭, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা ১৩
নিকল রোড, ব্যালার্ড এষ্টেট্, বোম্বাই ১
৩৬-এ, মাউণ্ট রোড, মাদ্রাজ ২
২৪।১, ক্যানসন হাউস, আসফ আলী রোড, নতুন দিল্লী
১৭।৬০, সন্ন্যাসীরাজু ষ্ট্রীট, বিজয়বাদ
১৭, নাজিমুদ্দিন রোড, ঢাকা

লংম্যান গ্রীন এণ্ড কোং লিমিটেড
৬-৭, ক্লিফোর্ড ষ্ট্রীট্, লণ্ডন, ডব্লিউ ১
এবং
নিউ ইয়র্ক, টরোণ্টো, কেপ টাউন ও মেলবোর্ণ

প্রথম প্রকাশ ১৯৫৬

মূল্য ৮০ আনা

মূদ্রাকর :
শ্রীকালীচরণ পাল, নবজীবন প্রেস,
৬৬, গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

সূচীপত্র

আমাদের শত্রু

বাঘ, ভালুক, সাপ, কুমীর—এই সব জন্তুকে আমরা ভয় করি। এরা সুযোগ পেলেই মানুষ খায়। কিন্তু আমরা খোঁজ নিলে দেখবো যে প্রতি বছর খুব বেশী লোক এদের হাতে মরে না। মশা, মাছি, পোকা, জীবাণু প্রভৃতি ছোট ছোট জন্তুরা আমাদের আরও বেশী অনিষ্ট করে। এদের মধ্যে এক জীবাণু ছাড়া আর সবগুলিই খালি চোখে দেখা যায়।

এই জীবাণু যদি অনেকগুলি শরীরে ঢুকবার সুযোগ পায় তবে তারা যে ক্ষতি করে তা বাঘ, ভালুকে যে ক্ষতি করে তার চেয়ে অনেক বেশী। বাঘ, ভালুকের বেলায় একটা সুবিধা আছে এই যে, তাদের খালি চোখে দেখা যায় ; কাজেই তাদের সহজে এড়াতে পারা যায়। কিন্তু জীবাণুর বেলায় এই সুযোগ নাই। তাদের খালি চোখে দেখা যায় না কাজেই তারা আমাদের চারপাশে সব সময় থাকে এবং তাদের একেবারে এড়াতে পারিনা।

খাবারের অভাব, কোন জিনিষ খাওয়া উচিত এবং কোন জিনিষ খাওয়া উচিত নয় তা না জানা, আর কতকগুলি খারাপ অভ্যাসই বেশীর ভাগ রোগের কারণ। মদ খেলে, বেশী সিগারেট বিড়ি খেলে ও ভেজাল ওষুধের জন্যও রোগ হয়। কলকারখানায় খুব বেশী খাটুনির ফলেও অনেক সময় শরীর ভেঙে যায় এবং মানুষ অকালে মারা যায়।

অনেক সময় আমরা বলি, "রাখে হরি মারে কে? মারে

হরি রাখে কে ?” পরমায়ু ফুরোলে ডাক্তার, কবিরাজ কিছু করতে পারবে না ; যে যতদিন পরমায়ু নিয়ে এসেছে সে ততদিন বাঁচবে। কিন্তু একথা ঠিক নয়। আমরা দেখতে পাই যে ইউরোপ ও আমেরিকার লোকেরা আমাদের চেয়ে অনেক বেশী দিন বাঁচে। তা'হলে ভগবান কি আমাদের দেশের লোকদের কম ভালবাসেন আর ইউরোপ, আমেরিকার লোকদের বেশী ভালবাসেন ? তাই আমাদের কম পরমায়ু দিয়েছেন আর ইউরোপ, আমেরিকার লোকদের বেশী আয়ু দিয়েছেন ? আসল জিনিষ কি জান ? ভাল খায়, নিয়মে থাকে, ভাল বাড়ীতে বাস করে আর শরীর পালনের নিয়ম মেনেচলে বলেই ইউরোপ, আমেরিকার লোকেরা বেশী দিন বাঁচে। আমরা ভাল খেতে পাইনা, খারাপ বাড়ীতে থাকি, শরীর পালনের নিয়ম মানিনা বলেই বেশীদিন বাঁচি না। মহাত্মা গান্ধী বলতেন যে তিনি ১২৫ বছর বাঁচবেন। নিয়মে থাকতেন বলেই তিনি একথা বল্‌তে পারতেন।

এখন প্রতি ১০০ জনের মধ্যে যত লোক মরে আগে তার চেয়ে বেশী লোক মর্‌ত। তার কারণ কি জান ? শহর ও পাড়াগাঁয়ের পথঘাটে থাকত ময়লা। ছোঁয়াচে রোগ সহজে এক জনের কাছ থেকে অন্য লোকের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ত। ডাক্তার ও কবিরাজেরা অনেক সময় রোগের জীবাণু যাতে ছড়িয়ে না পড়ে তার দিকে খুব বেশী নজর দিত না।

অনেক লোকের অন্ধ বিশ্বাস ছিল যে চন্দ্রগ্রহণ বা দুটি গ্রহের কাছাকাছি আসার জন্য প্লেগ রোগ হয়। এজন্য তারা এই রোগের চিকিৎসা করত না। ঘা, ফোড়া হলে নাপিতরা

চিকিৎসা করত; এদের বলত, "নাপিত ডাক্তার।" রোগীর শরীর হতে বদ রক্ত বের করে দেবার জন্য তাদের অংগে জোঁক লাগিয়ে দেওয়া হত।

খারাপ খাবার এবং বেশী খাবার খেলে আমাদের অসুখ হয়। কেবল চর্বি বা প্রোটিন জাতীয় খাবার খাওয়ার জন্য অনেক কঠিন

গ্রামবাসীরা জল দূষিত করছে

অসুখ হয়। কিন্তু বেশীর ভাগ লোকে ভোগে পুরা খাবার খেতে না পাওয়ার বা ভিটামিন না থাকা খাবার খাওয়ার জন্য। খুব কম দেশ দেখতে পাওয়া যায় যেখানের বেশীর ভাগ লোকেরা শরীর গঠনের যোগ্য ভিটামিন-যুক্ত খাবার ঠিকমত খেতে পায়।

পোকা-মাকড়ের কামড়ে রক্ত বিষিয়ে অনেক রোগ হয় এবং কতক রোগ হয় যদি পোকা-মাকড় খাবার জিনিষের উপর বসে খাবার দূষিত করে। কিন্তু মাম্‌স, হুপিং কফ্, ইনফ্লুয়েঞ্জা, এমন কি যক্ষ্মা প্রভৃতি রোগ এভাবে হয় না। এগুলি রোগীর কফ্, থুথু ইত্যাদি হতে ছড়িয়ে পড়ে। মাম্‌স রোগের লক্ষণ ভালভাবে ফুটে উঠ্‌বার আগেই এ রোগ খুব সংক্রামক হয়ে পড়ে। কতকগুলো রোগ আছে সেগুলো মাম্‌স জাতীয় সংক্রামক রোগ।

দূষিত জলও স্বাস্থ্যের অনেক ক্ষতি করে। শহরে জল-সরবরাহের উপর সেজন্য বেশী জোর দেওয়া হয়। জল ব্যবহারের আগে তা শোধন করা এবং নল দিয়ে সব জায়গায় চালান করার আগে তাতে "ক্লোরিণ" মিশান দরকার। খাবার ও ওষুধ খাঁটি না হলে তা শরীরের ক্ষতি করে। খাবারে জীবাণু আছে কিনা তা ডাক্তার দিয়ে পরীক্ষা করান ভাল। তাহলে স্বাস্থ্য ভাল থাকে। কোনরকম রোগ হবার ভয় থাকেনা।

বড় রকম দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পেতে হলে সাবধান হতে হবে তা না হলে জীবনের হানি হতে পারে। পথ পার হওয়ার বেলায় সাবধান হতে হবে যাতে গাড়ী চাপা না পড়তে হয়। পথ চলার নিয়ম গাড়ীর "ড্রাইভার" ও পথিক সকলেরই মেনে চলা দরকার।

ছোটখাট কাটা-ছেঁড়ার বিষয়েও সাবধান হওয়া দরকার। খুব ছোট কাটায় সাবধান না হলেও চলে, কারণ চামড়া গজিয়ে যায়গাটা তাড়াতাড়ি ভরাট হয়ে যায়। কিন্তু বড় কাটার বেলায় সাবধান হতে হবে, তা না হলে জাবাণু লেগে যায়গাটা বিষিয়ে যাবে। ঐ কাটায় "আয়োডিন" লাগান ভাল।

চোখের ভিতরে কোন রকম ময়লা বা বালি পড়লে রুমালের কোনা বা উটের লোমের তুলি দিয়ে তা সাবধানে বের করে ফেলা দরকার। যদি তাতে উপকার না হয় তবে জল ভর্তি পাত্রে চোখটি কিছুক্ষণ ডুবিয়ে রাখতে হয়।

ঘর-বাড়ী

গত কয়েক বছর ধরে ভারতবর্ষে লোকসংখ্যা খুব বেড়ে গেছে। এর কারণ হল জন্মের হারের তুলনায় মৃত্যুর হার কম হওয়া এবং পাকিস্তান হতে বাস্তু-হারাদের ভারতীয় ইউনিয়নে আসা। এজন্য অনেক যায়গায় খুব অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছে। ঘনবসতি বস্তিগুলি গড়ে উঠেছে। গভর্ণমেন্ট সমস্যা দূর করার জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন এবং আশা করা যায় পরের পাঁচ হতে দশ বছরের মধ্যে বস্তিগুলি উঠে যাবে ও তাদের যায়গায় সস্তা ভাড়ায় ভাল বাড়ী পাওয়া যাবে।

গ্রামের কুড়ে ঘরই হোক আর শহরের অট্টালিকাই হোক, একটি বাড়ী তৈরির বেলায় নীচের সাধারণ নিয়মের দিকে নজর রাখতে হবে তবেই বাড়ীগুলি স্বাস্থ্যকর হয়ে উঠবে ঃ—

(১) অবস্থান,
(২) গঠন,
(৩) আর নালা ও ময়লা পরিষ্কারের ব্যবস্থা।

যেখানে বসত বাড়ী তৈরি হবে সে যায়গা উঁচু ও শুকনো হওয়া দরকার। খড়ি-মাটি বা পাথুরে মাটি বাড়ী তৈরির যায়গা হিসেবে খুব ভাল। কাটা-মাটি এবং বালি-মাটি গরম কালে খুব গরম ও শীতে খুব ঠান্ডা বলে বাড়ী তৈরির যোগ্য জমি নয়। যায়গাটা এমন হবে যেখানে খোলা বাতাস ও রোদ আসতে পায়। কাছে পুকুর, দীঘি বা নদী থাকলে তা ক্ষতির

কারণ হতে পারে। রসায়নের কারখানা, কবর-ভূমি, ইটের ভাটি বা পচা সব্‌জি জমে আছে এমন জায়গার কাছাকাছি বাড়ী করা উচিত নয়। বাড়ীর কাছাকাছি যদি নিম, ইউক্যালিপ্‌টাস গাছ থাকে তা হলে ভাল।

উঁচু শক্‌ত যায়গায় বাড়ী তৈরি করা উচিত। ঘরে খুব
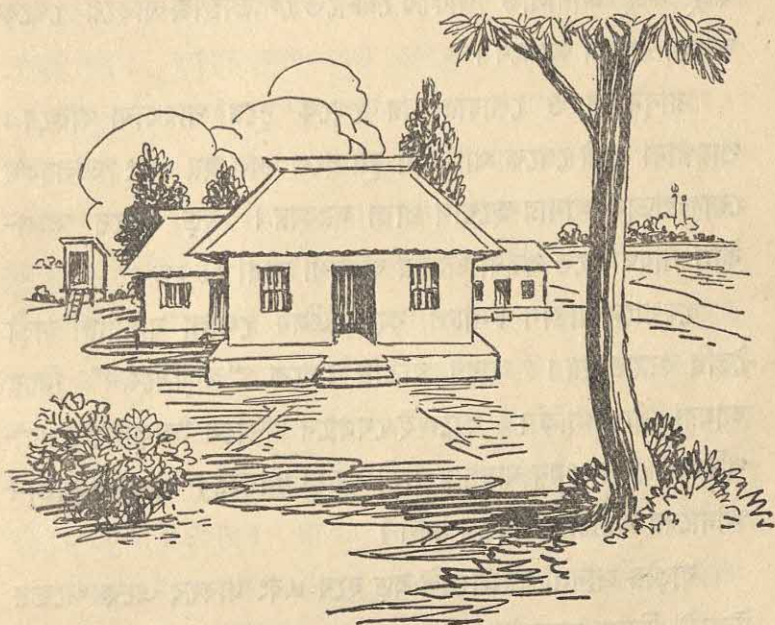
উঁচু ও শুকনা জায়গায় বসত বাড়ী

আলোবাতাস খেলবে। দেওয়াল সিমেন্‌ট বা মাটি দিয়ে লেপা হবে। ঘরের মেঝে স্যাঁত-স্যেঁতে হলে অসুখ হতে পারে। মেঝে ইট বা পাথর দিয়ে তৈরি হলে ভাল হয়।

বসতির দিকে খানিকটা মনোযোগ দিতে হবে। একটার পিছনে আর একটা তৈরি করা ঠিক হবে না। যদি সম্ভব

হয় তবে দক্ষিণে বা পূর্ব্বে মুখ করে শোবার ঘর তৈরি হবে যাতে দিনের কিছু না কিছু সময় প্রত্যেক ঘর খানিক রোদ পায়। প্রত্যেক ঘর যাতে সোজাসুজি বাইরে থেকে আলো পায় এভাবে বাড়ী তৈরি করতে হবে। ঘরের উচ্‌চতা নয় ফুটের কম ও বারো ফুটের বেশী হবে না। প্রত্যেক ঘরে অন্‌ততঃ দুইটা ঋজু ঋজু জানালাও থাকবে যেটাতে সোজাসুজি বাইরে থেকে আলো বাতাস আসবে।

রান্‌নাঘর ও শোবার ঘর থেকে দূরে পায়খানা থাকবে। পায়খানা বাড়ী থেকে খানিকটা দূর হলে ভাল হয় এবং ভালরকম রোদ-বাতাস আসার সুযোগ থাকা দরকার। বড় শহরে আজ-কাল পায়খানাতে ঝরণা জলের ব্যবস্‌থা রাখা হচ্‌ছে।

যেখানে বাতাস চলাচল করে এমন খোলা যায়গায় বাড়ী তৈরি করতে হয়। কারণ বাতাস থেকে "অক্‌সিজেন" নিয়ে আমরা বেঁচে থাকি। কাজেই যেখানে বাতাসে "অক্‌সিজেনের" পরিমাণ বেশী এমন যায়গায় বাড়ী হওয়া দরকার। খোলা বাতাস আমাদের শরীরের পক্‌খে ভাল।

বাড়ীর জানলা-দরজাগুলি বড় হবে এবং থাকবে একে অন্যের উল্‌টো দিকে, যাতে একসংগে খোলা থাকলে একদিকে হাওয়া ঢুকে আপনি অবাধে অন্যদিকে বেরিয়ে যেতে পারে। ছাদের কিছু নীচেই দেয়ালে কয়েকটি "ভেন্‌টিলেটার" বা খুলখুলি থাকবে। যাতে দরজা-জানলা বন্‌ধ থাকলেও ঘরে বাতাস খেলতে পারে।

বাতাস কখনও এক যায়গায় থাকতে পারে না, এদিকে সেদিকে ছড়িয়ে পড়ে। কাজেই ঘরের বাতাস গরম হলে মুক্‌ত বাতাস তার যায়গা দখল করে। এর নাম বায়ু-চালন।

দূষিত বাতাসকে সরিয়ে দেবার জন্য কৃত্রিম উপায়েও এই বায়ু-চালন করা যায়। এতে শরীর ভাল থাকে।

এই কৃত্রিম বায়ু-চালনের দ্বারা ঘরের দূষিত বাতাসকে বের করে দিয়ে বাইরের মুক্ত বাতাসকে ঘরে টেনে আনা যায়। এজন্য খুলখুলিতে বা জানলায় পাখা বসিয়ে বাইরের বাতাসকে ঘরে টেনে এনে উল্‌টোপথে ভিতরের বাতাসকে বাইরে ঠেলে দেওয়া হয়। আবার আর এক রকমের পাখার দ্বারা ঘরকে বায়ু শূন্য করলে বাইরের মুক্ত বাতাস তার যায়গা দখল করে। দেওয়ালের নাচে জালতি লাগানো ছিদ্র রাখলে বাইরের ভারী ও ঠাণ্ডা হাওয়া ঢুকে ভিতরের বাতাসকে শোধন করবে। পাথুরে চুণ বা কাঠকয়লা রাখলেও ঘরের বাতাস শোধিত হয়।

বাড়ী ও চারপাশ পরিষ্কার রাখা খুব দরকার। এতে স্বাস্থ্য ভাল থাকে, পোকা-মাকড় ইত্যাদির উপদ্রব হতে পায় না। বাড়ীর প্রত্যেক ঘর বিশেষ করে রান্না-ঘর পরিষ্কার রাখা উচিত। ধুলো-বালি, ঝুল, মাকড়সার জাল প্রভৃতি সর্বদাই সরিয়ে ফেলা দরকার। ঘরের জিনিষপত্র ঝাড়া-মোছা উচিত এবং বিছানা মাঝে মাঝে রোদে দেওয়া ও সাবান দিয়ে কাচা দরকার। পাকা ঘর হলে বছরে একবার প্রতি ঘর চুণকাম করা দরকার। কাঁচা বাড়ী হলে গোলামাটি দিয়ে মাঝে মাঝে দেওয়াল নিকান ভাল। ধূপ, ধূনো জ্বালালে ঘরের বাতাস বিশুদ্ধ থাকে।

ঘর যেমন পরিষ্কার রাখা দরকার তেমনি ঘরের চারপাশও পরিষ্কার রাখতে হবে। গরু-বাছুর বা ছেলেমেয়ের মলমূত্র যাতে বাড়ীর ভিতর বা বাড়ীর চারপাশে জমতে না পারে তা দেখতে হবে। ঐ সব ময়লা ফেলার ব্যবস্থা করতে হবে। ঐ

সব ময়লা পুড়িয়ে ফেললে ভাল হয়, না হলে ঐ গুলি মাটি বা ছাই চাপা দিয়ে দিতে হবে। ঐগুলি গর্ত করে পুতে রাখলে পরে ভাল সার হবে। শহরে ময়লা ফেলার ভাল ব্যবস্থা আছে। সেখানে পথের ধারে গোলাকার পাত্র রাখা হয়। বাড়ীর ময়লা যেখানে সেখানে না ফেলে ঐ পাত্রে ফেলা উচিত। কর্পোরেশন বা মিউনিসিপ্যালিটির লোক এসে ঐ ময়লা গাড়ী করে নিয়ে যায়।

তরল ময়লা ফেলার জন্য নালা তৈরি দরকার। নালা পাকা করা দরকার কারণ কাঁচা নালাতে অনেক অসুবিধার স্রষ্টি হয়। নালা তৈরি সম্ভব না হলে বাড়ীর ময়লা বাড়ী থেকে দূরে কোন গর্তে ফেলা উচিত। সেই গর্তে ফিনাইল বা কেরোসিন তেল ঢেলে দিলে মশা হতে পায় না এবং রোগের জীবাণুর হাত থেকেও রেহাই পাওয়া যায়। শহরে মাটির নীচেকার নালা স্বাস্থ্যের পক্ষে সব চেয়ে ভাল।

স্বাস্থ্যকর মলশোধক পায়খানা সবচেয়ে ভাল। তবে তা করতে খরচ বেশী বলে শহরে অনেক খাটা পায়খানা দেখা যায়। এগুলি রোজ পরিষ্কার করান দরকার। ব্লিচিং পাউডার, ফিনাইল, চূণ ইত্যাদি দিয়ে শোধন করান উচিত। পল্লীতে কুয়া পায়খানা দেখা যায়। এগুলি পরিষ্কার করান কঠিন। তবে এগুলি বাড়ী থেকে দূরে হলে এবং ব্লিচিং পাউডার, চূণ প্রভৃতি দেওয়ার ব্যবস্থা থাকলে ভাল হয়।

বাড়ীর আশে-পাশে খানা-ডোবা থাকলে তাতে মাঝে মাঝে ফিনাইল বা কেরাসিন তেল ঢেলে দিলে মশা হবে না। আশে-পাশের জমিতে যাতে কিছু জমে দুর্গন্ধ না হয় তা দেখা দরকার।

অনেক সময় বাড়ীর বাইরেকার ময়লা, ধূলো, বালি, উড়ে এসে ঘর নোংরা করে। এজন্য প্রতিটি ঘর রোজ ঝাড়ামোছা উচিত। ফিনাইল, ডেটল নিয়ে মাঝে মাঝে ঘর পরিষ্কার করাও দরকার।

আমাদের দেশে এমন অনেক বাড়ী তৈরি হয় যাতে তার ঘরগুলোতে একটুও আলো ঢোকবার সুযোগ পায়না। কিন্তু এটা ঠিক নয়। সূর্য্যের আলো জীবাণু নষ্ট করে এবং তা চোখের পক্ষেও উপকারী।

ঘরে যাতে ভালরকম সূর্য্যের আলো আসে এজন্য বাড়ীর চারদিকে বেশ খানিকটা খোলা জায়গা রাখা দরকার। অন্ততঃ পক্ষে বাড়ীর সামনের ও পিছনের পথটা যাতে বেশ চওড়া হয় তা দেখা দরকার। বাড়ীর কাছে গাছ হতে দেওয়া ঠিক নয় তা' হলে আলো ও বাতাসের অভাব হয়। একটু দূরে গাছ থাকলে ভাল কারণ তাতে কিছুটা বাড়তি বাতাস পাওয়ার সুবিধা হয়। বাড়ীর ঘরগুলো পূর্ব, দক্ষিণ, বা পশ্চিম মুখো হবে যাতে রোদ সহজে ঢুকতে পায়।

জানলাগুলো ঘরের আকার অনুযায়ী হবে এবং মেঝের মাপের প্রায় সিকি ভাগ হবে। দেয়ালের রঙ্ এমন গাঢ় হবেনা যাতে আলো শুষে নিতে পারে। জমকাল রঙের দেয়াল ও জমকাল রঙীন আসবাব আলো টেনে নেয়। ঘরের দেওয়াল ও সিলিং সাদা রঙের হবে এবং আসবাবগুলি হবে হাল্কা রঙের।

ঘরের আলো বাঁদিক দিয়ে আসাই ভাল। যদি তা সম্ভব না হয় তবে দক্ষিণ দিক দিয়ে আসবে। কোন সময়েই উপর থেকে বা সামনে থেকে আলো আসতে দেওয়া ঠিক নয়। উপর, পিছন

ও ডান দিক থেকে আলো এলে ঘরের ভিতর যে কাজ করা হয় সেই কাজের উপর ছায়া পড়ে, আর সোজাসুজি এলে চোখের ক্ষতি হয়।

বিদ্যুৎ, গ্যাস, তেল বা মোমবাতির দ্বারা ঘরকে কৃত্রিম উপায়ে আলো করা যায়। এর মধ্যে বিদ্যুতের আলো সবচেয়ে ভাল কারণ এই আলো স্থির ও ঠান্ডা। এ আলো বাতসকে দূষিত করে না। গ্যাসের আলো তেমন ভাল নয় কারণ এ আলো বাতাসকে দূষিত করে। আবার ভালভাবে ঢাকা দেওয়ার ব্যবস্থা না থাকলে এ থেকে আগুন লাগারও ভয় আছে। বিদ্যুৎ বা গ্যাসের আলো না থাকলে কেরাসিন তেলের আলো ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে এ আলোও ভালভাবে ঢাকা দেওয়ার ব্যবস্থা করা দরকার। এও গ্যাসের আলোর মতই বাতাসকে দূষিত করে। মোমবাতির আলো স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল তবে এতে খরচ খুব বেশী পড়ে।

আমাদের দেশে গরম কালে ঠাণ্ডা ঘর সকলেই পছন্দ করে। এজন্য আগেকার দিনে মাটির নীচে ঘর তৈরি করার যে নিয়ম ছিল তা কিন্তু স্বাস্থ্যকর নয়। কারণ এগুলিতে বাতাস ঢোকার সুবিধা খুব কম। ঘরকে গরম হতে না দেবার জন্য বারান্দা রাখা দরকার। ঘরের দেয়াল ও ছাদ বা চাল পুরু করে তৈরি করা দরকার। শহরে গরম কমাবার জন্য বিদ্যুতের পাখা ও "খস্‌খস" ব্যবহার করা হয়।

শীতকালে ঘরকে গরম রাখার জন্য ঘরে আগুন রাখার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এছাড়া বড় বড় শহরে অনেক বাড়ীর দেয়ালে পোঁতা নলের মধ্য দিয়ে গরম বাতাস, জল বা আগুন

বইয়েও ঘরকে গরম রাখা হয়। আমাদের দেশে শীতের দিন-গুলি ছাড়া অন্য সময় ঘর গরম রাখার দরকার হয় না।

ঘরের দেয়ালে চুন দেওয়া চলে। দেয়ালে বছরে একবার চুণ দিলে জীবাণু নষ্ট হয়ে যায়। ঘরের মেঝে গোবর দিয়ে লেপা ঠিক স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল নয়। কারণ এতে মাছি এসে জায়গাটায় জীবাণু ছড়াতে পারে। মাটির ঘরের মেঝের মাটি বছরে দুবার খুঁড়ে ফেলে সেখানে নূতন মাটি দেওয়া দরকার।

ঘরের আসবাবগুলো যেন সহজে নাড়া-চাড়া করা চলে যাতে তাদের দিয়ে আড়ালকরা যায়গাগুলো রোজ পরিষ্কার করা যায়। ঘরে আসবাব যেন খুব বেশী না থাকে। আসবাবগুলো সময়ে সময়ে পরিষ্কার করা এবং বছরে দুবার অন্ততঃ তাদের জায়গা বদল করা ও রোদে দেওয়া দরকার। কাঠের জিনিষগুলো মাঝে মাঝে পালিশ করা ও সাবান জলে ধোওয়া দরকার।

মাছি যাতে বাড়ীতে আসতে না পায় সেদিকে সাবধান হতে হবে। বাড়ীতে মাছি যাতে থাকতে না পায় সেজন্য মাছি তাড়াবার ওষুধ ব্যবহার করতে হবে। দরজা-জানলাগুলোতে আড়াল দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। ঘরের মেঝে ভাল করে রোজ ঝাঁট দিতে ও মুছতে হবে।

নালা ঃ—নালার কথা আগেই বলা হয়েছে। বাড়ীর ছোট নালা যেন "মহল্লা" বা গলির বড় নালার সংগে যুক্ত থাকে। যদিও পথ ও নালা পরিষ্কারের ভার মিউনিসিপ্যালিটির ঝাড়ু-দারের উপর তবুও পথ পরিষ্কার করে নালাতে ময়লা ফেলা উচিত নয়।

আমাদের খাবার

খাওয়ার প্রয়োজন—আমরা খাবার খাই খিদে মেটাতে। কিন্তু শুধু খিদে মেটাতে খাবারের দরকার হয় না। খাবারের আরও প্রয়োজন আছে। সে প্রয়োজনগুলো হল, শরীরের ক্ষয় দূর করা, শরীরের পুষ্টি ও বৃদ্ধি, এবং শরীরে শক্তি বাড়ানো। একটা ইন্‌জিন্ চালাতে হলে যেমন কয়লা ও জলের দরকার হয় তেমনি যেহেতু মানুষের শরীরও একটা ইন্‌জিন্ একেও চালু রাখতে হলে খাবারের দরকার। খাবার না পেলে শরীরে ক্ষয় বেড়ে যাবে এবং সেজন্য নানারকম রোগ দেখা দেবে। এই রোগকে রুখবার জন্য খাবার দরকার।

খাবার দু'রকমের জিনিষ থেকে পাওয়া যায়। যথা, (১) প্রাণীর শরীর থেকে, (২) গাছপালার শরীর থেকে। প্রাণী থেকে যে সব খাবার পাওয়া যায় সেগুলো হচ্ছে মাছ, মাংস, দুধ, ডিম ইত্যাদি। আর ধান, গম, ফল, সব্জি এগুলো গাছপালা থেকে পাওয়া যায়।

খাবারে ছয় রকমের উপাদান আছে, যেমন আমিষ, শর্করা, তেল, জল, লবণ ও ভিটামিন। এগুলি কোন না কোন খাবারে কিছুটা করে থাকেই। এগুলি শরীরকে পুষ্ট করে।

(১) আমিষ জাতীয় খাবার—মাছ, মাংস, ডিম, ছানা প্রভৃতি আমিষজাতীয় খাবার। এরা খুব উপকারী। ডাল আটা, বাদামও আমিষজাতীয় খাবার। এই আমিষজাতীয় খাবারে শরীরের পুষ্টি ও বৃদ্ধি দুইই হয়।

(২) শর্করা জাতীয় খাবার—চাল, ডাল, আটা, সুজি, ময়দা ইত্যাদি হল শর্করাজাতীয় খাবার। তরকারী, ফল, চিনি, গুড় এগুলিও শর্করাজাতীয় খাবার। এগুলি শরীরে শক্তি বাড়ায়। যারা বেশী খাটে তাদের এই শর্করাজাতীয় খাবার বেশী দরকার হয়।

(৩) তেলজাতীয় খাবার—ঘি, মাখন, চর্বি, তেল, বাদাম এগুলো তেলজাতীয় খাবার। এদের মধ্যে ভিটামিন থাকে, তবে সবগুলোর একরকম ভিটামিন থাকে না। এই তেল-জাতীয় খাবারে কাজের ক্ষমতা বাড়ায়। এজন্য শীতের দেশের লোকের এবং আমাদের দেশেও যারা বেশী খাটে তাদের, এই তেল জাতীয় খাবারের বেশী দরকার হয়।

(৪) জল—আমাদের বেঁচে থাকার জন্য জল সবচেয়ে বেশী দরকারী। হজমের কাজ ভালভাবে চালাতে হলেও জলের দরকার। শুধু তেষ্টার সময় যে জল খেতে হবে তা নয়, দিনে নিয়ম করে যত বেশী পারা যায় জল খাওয়া ভাল। তবে জল খাওয়ার সময় কিছুটা সাবধান হতে হবে। তা না হলে দূষিত জল খেয়ে আমাশয় প্রভৃতি রোগ হতে পারে। খুব খাটুনির পর সংগে সংগেই জল খাওয়া ভাল নয়। এতে সর্দি-গর্মি হতে পারে। খাওয়ার আগে বা পরে জল খাওয়া ভাল নয়।

(৫) লবণ—চাল, ডাল, গম, দুধ, ফল-মূল, ডিম প্রভৃতিতে লবণ থাকে। এই লবণ হাড় তৈরীতে ও হজমে সাহায্য করে।

(৬) ভিটামিন—খাবারের মধ্যে একটা খুব উপকারী জিনিষ থাকে তার নাম ভিটামিন। ভিটামিন চোখে দেখা

যায় না। কিন্তু খাবারে ভিটামিন না থাক্‌লে শরীর গড়ে উঠে না বা শরীরে শক্তি হয় না। কোন ভেজাল খাবারে ভিটামিন থাকে না। এজন্য ভেজাল খাবার খাওয়া ঠিক নয়। দুধ, ডিম, মাছ, মাংস, টমেটো, দুধের সর, পালং শাক, লেটুস, ও ঢেঁড়সে ভিটামিন খুব বেশী থাকতে দেখা যায়, তবে ভিটামিন সব খাবারে ঠিক সমানভাবে থাকে না, কোনটায় বেশী আর কোনটায় কম থাকে। খাবার আগুনের অঁাচে অথবা কোন জায়গায় বেশীদিন রেখে দিলে ভিটামিন নষ্ট হয়ে যায়। টাট্‌কা খাবারে ভিটামিন বেশী থাকে। সেজন্য টাট্‌কা খাবার খাওয়া ভাল।

সুস্থ ভাবে বেঁচে থাকতে হলে খাবারে ভিটামিন থাকা খুব বেশী দরকার। ভিটামিন হাড়, দাঁত ও রক্ত ভাল রাখে, হজমেও খুব সাহায্য করে। কাজেই খাবারের সংগে ভিটামিন বেশী করে পেটে গেলে কোন রোগই সহজে হতে পারে না।

খাবারের সংগে সবরকম ভিটামিন পেটে না গেলে কতকগুলো রোগ হয় যেমন, রিকেটস, স্কার্ভি, বেরিবেরি, যক্ষ্মা প্রভৃতি রোগ। এই সব রোগ না হতে দেবার একমাত্র উপায় হল ভিটামিন বেশী করে 'খাওয়া। টাট্‌কা শাক্-সব্‌জি, ফল-মূল, মাছ, দুধ প্রভৃতিতে ভিটামিন বেশী থাকে—কিন্তু শহরে এই টাট্‌কা খাবার পাওয়া খুব কঠিন। তাই পল্লীর খাবারের চেয়ে শহরের খাবারে ভিটামিন খুব কম থাকে। আবার খাবারে ভিটামিন না থাকার জন্য যে সব রোগ হয় তাও শহরেই বেশী।

ভিটামিন গাছপালাতেই বেশী থাকে তবে জন্তুর শরীরেও ভিটামিন পাওয়া যায়। মাছের তেলে বিশেষ করে কড্ মাছের

তেলে ভিটামিন খুব বেশী থাকতে দেখা যায়। সূর্য্যের আলোতেও মানুষের শরীরে ভিটামিন স্বষ্টি হয়।

এই ভিটামিনকে ছয় ভাগে ভাগ করা হয়েছে, যেমন, ভিটামিন "এ", ভিটামিন "বি", ভিটামিন "সি", ভিটামিন "ডি", ভিটামিন "ই" ও ভিটামিন "কে"।

ভিটামিন "এ"—মাছের তেল, মাছের ডিম, কড্ মাছের তেল, ভেড়ার মাংস, ডিমের কুসুম, মাখন, দুধ, গাজর, বাঁধাকপি, লেটুস, মূলাশাক, পুঁইশাক, কড়াইশুটি, লাল-আলু, পাকা বিলাতি বেগুন, পাকা আম, পাকা পেঁপে, শাক্-সব্জি ইত্যাদিতে ভিটামিন "এ" খুব বেশী থাকে। চর্বিতে এই ভিটামিন থাকে না। এই ভিটামিন ক্ষয় রোগের হাত হতে শরীরকে বাঁচায় ও শরারে শক্তি আনে। এতে হজম ভাল হয় ও শরীরে পুষ্টি হয়। এই ভিটামিন না পেলে শিশুরা বাড়ে না, চোখের অসুখ, চামড়ার রোগ, সর্দি-কাশি প্রভৃতি হয়। ফুটালে এই ভিটামিন নষ্ট হয় না কিন্তু শুকিয়ে রাখলে এই ভিটামিন নষ্ট হয়ে যায়। সেজন্য গুঁড়ো দুধে এই ভিটামিন থাকে না। কড্ মাছের তেলের মধ্যেকার এই "এ" ভিটামিন বাতাস ও গরম পেলে নষ্ট হয়ে যায়। এজন্য "কড্লিভার তেল" আঁট ছিপিতে রঙীন কাঁচের মধ্যে ঠাণ্ডা জায়গায় রাখতে হয়। পাতার সবুজ ভাগটা পেটে গেলে লিভার হতে এই ভিটামিন তৈরি হয়।

ভিটামিন "বি"—ঢেঁকিছাঁটা চাল, যাঁতাভাঙা আটা, ডিম, দুধ, টমেটো, পালং শাক, বাঁধাকপি, শালগম, লেটুস, নারকেলের শাঁস, ভুট্টা, বরবটি, বাদাম, আঁকুড়, কলা-বেরোনো ছোলা-মটর

ইত্যাদিতে ভিটামিন "বি" খুব বেশী রকম থাকে। কলে-ছাঁটা চাল, আটা-ময়দা ইত্যাদিতে এই ভিটামিন একেবারেই থাকে না বললে চলে। এজন্য বেরিবেরি, অজীর্ণ প্রভৃতি রোগ হয়। হজম ঠিকমত হয় না। এই ভিটামিন ঠিকমত না পেলে শরীরও ভালভাবে বাড়তে পায় না, দুর্বল হয়ে পড়ে। চালের ও গমের খোসার ঠিত নীচেই এই ভিটামিন থাকে। কলে ছাঁটার সময় ঐ ভিটামিনের জায়গাটা বাদ পড়ে যায়। ফলে চালে আর ভিটামিন থাকতে পায় না। গমের বেলায়ও তাই। যাঁতায় ভাঙ্‌লে গমের ভিটামিন নষ্‌ট হতে পারে না, কলে ভাঙ্‌লে নষ্‌ট হয়ে যায়।

ঢেঁকিছাঁটা চাল বার বার ধুলে এই ভিটামিন জলের সংগে বের হয়ে যায়। আগুনের তাতে এই ভিটামিন সহজে নষ্‌ট হয় না কিন্‌তু চাল বেশী সিদ্‌ধ করলে এই ভিটামিন নষ্‌ট হয়ে যায়। ভাত রেঁধে ফেন ফেলে দিলে ভিটামিন বের হয়ে যায়। সেজন্য ভাত রেঁধে ফেন না ফেলে খাওয়া উচিত। শাক্‌-সব্‌জি, তরি-তরকারী ইত্যাদি জলে সিদ্‌ধ করে জল গেলে ফেললে তার সংগে ভিটামিন বের হয়ে যায়।

ভিটামিন "সি"—কমলালেবু, পাতিলেবু, বাতাবীলেবু, টমেটো, আমলকী, ফলমূল, কলা-বেরোনো ছোলা-মটর ও কাঁচা লংকাতে এই ভিটামিন খুব বেশী থাকে। কাঁচা দুধেও এই ভিটামিন থাকে। খাদ্য সিদ্‌ধ করলে এই ভিটামিন নষ্‌ট হয়ে যায় তাই এ সব খাবার কাঁচা খাওয়া ভাল। এই ভিটামিন রক্‌তকে পরিষ্‌কার রাখে। হাত ও দাঁত ভাল রাখে। এই ভিটামিন না পেলে দাঁতের গোড়া নরম হয়, দাঁত খারাপ হয়। মুখে খারাপ গন্‌ধ হয়।

ভিটামিন "ডি"—দুধ, মাখন, ডিম ও কড্ মাছের তেলে ভিটামিন "ডি" থাকে। সূর্য্যের অতি বেগ্নী আলো চামড়ায় লাগলে শরীরে এই ভিটামিন তৈরি হয়। এই ভিটামিন না পেলে "রিকেট্স" রোগ হয়। এই রোগে শরীরের হাড়গুলো ভালমত পুষ্ট হয় না; বেঁকে যায়। ফলে মানুষ খোঁড়া হয়। এই ভিটামিন দাঁত গড়ে ও দাঁতের ক্ষয় দূর করে।

ভিটামিন "ই"—চাল, যব, গম, ভুট্টা, ডিম, লেটুস্, শাক, মটর, চা প্রভৃতিতে এই ভিটামিন পাওয়া যায়। এর কাজ দেহের শক্তি বাড়ানো। মায়ের পেটের শিশুর স্বাস্থ্যও এই ভিটামিন ভাল রাখে। এই ভিটামিন আগুন ও বাতাসের ছোঁয়া পেলেও সহজে নষ্ট হয় না।

ভিটামিন "কে"—নানারকম গাছপালায় ও আলফাফা নামে একরকমের ঘাসে এই ভিটামিন থাকে। এই ভিটামিন শরীরে না থাকলে কাটলে ছিঁড়লে শরীর থেকে বেশীরকম রক্ত বেরিয়ে যায়। রক্তপড়া সহজে বন্ধ হয় না।

আমাদের স্বাস্থ্য ভাল রাখতে হলে এই ভিটামিনগুলির প্রত্যেকটিই আমাদের খাওয়া দরকার। আমাদের খাবারে এগুলির অভাব হলে আমাদের নানারকম অসুখে ভুগতে হবে। কিন্তু যদি আমরা আমাদের খাবারের সংগে বেশীরকম শাক্-সব্জি ও ফল খাই তবে আমাদের দেহে ভিটামিনের অভাব হবে না।

আমরা চা, কফি, কোকো, এবং নানারকমের মসলা খাবারের সংগে খাই। মসলা খাবারকে সুস্বাদু করে। এই মসলা অল্প খেলে হজম ভাল হয়, কিন্তু বেশী খেলে শরীরের ক্ষতি হয়।

পান খাওয়ার অভ্যাস এদেশে খুব চলতি। চুণ, সুপারি, এলাচ, লবংগ দিয়ে পান তৈরি হয়। এই পান চিবিয়ে খেতে হয়। খাওয়ার পরে এই পান খেলে হজম ভাল হয়। কিন্তু বেশী পান খেলে মাড়ীর ক্ষতি হয় এবং দাঁতের গোড়া আল্‌গা হয়ে যায়। এজন্য রোজ মুখ ভালভাবে ধোয়া এবং দিনে দুবার দাঁত পরিষ্‌কার করা দরকার।

মদ, চা, কফি, কোকো ইত্যাদি জলীয় খাবারগুলি অল্‌প খেলে শরীর গরম থাকে। কাজের ক্ষমতা ও উৎসাহ বাড়ে। কিন্তু এগুলি বেশী খেলে শরীরের অনিষ্‌ট হয়।

এই তো গেল খাবারের আলোচনা, এবারে কতকগুলো খাবারের গুণ দেওয়া গেল যাতে আমরা সেগুলো ভালোভাবে খাওয়ার দিকে নজর দিতে পারি।

দুধ—দুধ একটি অতি পুষ্‌টিকর খাবার। এই দুধ খেতেও খুব ভাল। বড়দের কাছে গরুর দুধ আর শিশুদের মায়ের দুধ ভাল। তবে শিশুদের গরুর দুধ খাওয়া চলতে পারে। কিন্তু তাতে বেশীরকম জল মেশানো দরকার। পেট খারাপ হলে শিশুদের ছাগলের দুধ দেওয়া ভাল। গরুর দুধের চেয়ে মহিষের দুধ বেশী পুষ্‌টিকর। কিন্তু তা শিশুরা এবং যাদের হজমের ক্ষমতা কম এমন লোকেরা হজম করতে পারে না। দুধ ভাল হয় জন্তুদের খাবার ও তাদের চরে খাওয়ার সুবিধার উপর। যে গরু রোদে মাঠে চরে কাঁচা খাস খেতে পায় তার দুধ, যে গরু বাঁধা অবস্‌থায় শুকনো খড় আর ভুসি খেতে পায় তাদের চেয়ে বেশী পুষ্‌টিকর হয়। দুধ থেকে ক্ষীর সর, দই, ঘোল, মাখন, ছানা প্রভৃতি খাবার তৈরি হয়, এগুলিও খুব

পুষ্টিকর খাবার। একজন পুরো বয়সের লোকের শুধু দুধ খেয়ে বেঁচে থাকতে হলে দিন ৪ সের দুধ খাওয়া দরকার। এই দুধ কিন্তু দূষিত হলে স্বাস্থ্যের ক্ষতি করে, এজন্য দুধ যাতে দূষিত না হয় সে দিকে লক্ষ্য রাখা দরকার। এজন্য গরুর শরীর ও গোয়াল যাতে পরিষ্কার থাকে এবং দুধ দোহার সময় হাত ও দুধ দুইবার জায়গা যাতে ভালভাবে ধোয়া হয় তা দেখতে হবে।

ডিম—ডিমও দুধের মতই পুষ্টিকর খাবার। আমরা সচরাচর হাঁস বা মুরগীর ডিম খাই। ডিমের সাদা ভাগের চেয়ে হলদে ভাগ বেশী পুষ্টিকর। ডিমকে কাঁচা, আধ-সিদ্ধ, পুরো-সিদ্ধ ইত্যাদি ভাবে খাওয়া যায়। কাঁচাতে ডিমে যে গন্ধ থাকে, জলে সিদ্ধ করলে ডিমের সেই গন্ধ চলে যায়। বেশী সিদ্ধ করলে ডিমের ভিতরটা শক্ত হয়ে যায় তখন আধ-সিদ্ধ ডিমের চেয়ে সেটা হজম করা কঠিন হয়ে পড়ে। ডিম থেকে ভাল ভাল খাবার তৈরি করা যায়।

মাংস—আমিষ-জাতীয় খাবারের মধ্যে মাংস সবচেয়ে ভাল। সুস্থ জন্তুর কচি মাংস খাওয়া ভাল। পাঁঠার মাংসের চেয়ে ভেড়ার মাংস হজম করা কঠিন। পাখীর মাংস হজম করা সবচেয়ে সহজ। কিন্তু মুরগীর মাংসের মত এত সহজে অন্য কোন মাংস হজম করা যায় না। রোগীকে সেজন্য এই মাংস খেতে দেওয়া হয়। এটা পুষ্টিকরও খুব। আমাদের দেশের লোকে পাঁঠা ও ভেড়ার মাংস বেশী ভালবাসে। তারপরেই গরু ও শুয়ারের মাংস। জন্তুকে ভাল খাওয়ানোর উপর এই সব মাংস ভাল হয়। পাঁঠা কিংবা ভেড়াকে ছোলা খাওয়ালে

তাদের মাংস বেশী হয়, আবার তা পুষ্টিকরও হয়। গরুর মাংসের চেয়ে শুয়রের মাংসে চর্বি বেশী থাকে বলে তা বেশী পুষ্টিকর। আমাদের দেশের গরু বেশী খেতে পায় না বলে তাদের মাংস ভাল হয় না। পশ্চিমের গরুর মাংস বেশী পুষ্টিকর। হরিণের মাংসে চর্বি কম থাকে বলে তা সহজে হজম করা যায়। বেশী মাংস খেলে গেঁটে বাত প্রভৃতি রোগ হতে দেখা যায়। মাংস পচে গেলে জীবাণু দ্বারা তার মধ্যে একরকম বিষের সৃষ্টি হয়; তা খেলে লোকে মারা যায়। টিনের কৌটোর মাংস খাওয়া উচিত নয়। রুগ্ন জন্তুর মাংস খেলে তার রোগের জীবাণু শরীরে ঢুকে রোগ সৃষ্টি করতে পারে।

মাছ—মাছ খুব পুষ্টিকর খাবার। মাছ খেতেও খুব ভাল। তেলের ভাগ যে মাছে কম সেগুলি সহজে হজম করা যায় আর যেগুলিতে তেলের ভাগ বেশী সেগুলি হজম করা কঠিন। ছোটপোনা, কই, মাগুর, সিঙি, মৌরলা প্রভৃতি মাছে তেলের ভাগ কম সেজন্য এগুলি সহজে হজম করা যায়। আর ইলিশ, বড় রুই, ধাই, বড় কাত্‌লা, মৃগেল, প্রভৃতি মাছ হজম হতে দেরি হয়। টাট্‌কা মাছই ভাল, পচা বা বরফ দেওয়া মাছ ভাল নয়।

চাল—চাল শর্করাজাতীয় খাবার। চাল দু'রকমের হয়, সিদ্ধ আর আতপ। সিদ্ধ চাল ঢেঁকিছাটা হলেও তা বেশী পুষ্টিকর হয় না। কিন্তু আতপ চালে ধান সিদ্ধ করার দরকার হয় না বলে এগুলি বেশী পুষ্টিকর হয়।

আটা, ময়দা, সুজি—এই তিনরকম খাবারই গম থেকে তৈরি হয়। এই গমে তেল ও আমিষের ভাগ বেশী থাকে বলে এগুলি খুব পুষ্টিকর।

ডাল—ডাল আমিষ জাতীয় খাবার। এ খুব পুষ্টিকর এবং চোখ ভাল রাখে। কিন্তু এই ডাল ভালমত সিদ্ধ না হলে হজমের ক্ষতি করে।

তরি-তরকারী ও শাক্-সব্জী—তরকারী ও সব্জির মধ্যে গোল আলু, ওল, শালগম, কাঁচাকলা, মোচা, ডুমুর, বেগুন, টমেটো, ফুলকপি প্রভৃতি শর্করাজাতীয় খাবার। টমেটোর কাঁচা রস বা অল্প সিদ্ধ রস শরীরের পক্ষে খুব ভাল। লাউ, কুমড়ো, ঝিংগে প্রভৃতি তরকারীও বেশ ভাল এগুলিতে দাস্ত পরিষ্কার থাকে।

আম—ফলের মধ্যে সেরা হচ্ছে আম। আম খেলে শরীরে শক্তি হয় ও মাংস বাড়ে। এই ফল পায়খানা পরিষ্কার করে ও রক্তও বাড়ায়।

কাঁটাল—এই ফলটি সহজে হজম করা যায় না কিন্তু এতে শক্তি বাড়ে।

কলা—কলা খুব পুষ্টিকর খাবার। কিন্তু এই ফল হজম করা কিছু কঠিন।

পেঁপে—কাঁচা পেঁপে ও পাকা পেঁপে দুইই খুব ভাল। কাঁচা পেঁপে হজমে সাহায্য করে আর পাকা পেঁপে শরীর ঠাণ্ডা রাখে।

নারকেল—নারকেল খুব পুষ্টিকর। এই ফল শরীর ঠাণ্ডা রাখে। নারকেল দিয়ে ভাল ভাল খাবার করা যায়। সেগুলি খেতেও খুব ভাল। নারকেল থেকে যে তেল পাওয়া যায় তা দিয়ে অনেক জায়গায় রান্না হয়।

লেবু—লেবু অনেক রকমের আছে, কতকগুলি টক আর

কতকগুলি মিষ্টি। কতকগুলি আবার কাঁচায় টক থাকে পাকলে মিষ্টি হয়। লেবু খেতে খুব ভাল। এতে বাত সারে। কমলা, বাতাবি, কাগজি ইত্যাদি সবরকম লেবুই খুব পুষ্টিকর।

বাদাম—বাদাম খুবই পুষ্টিকর। তবে বাদামকে খুব ভাল ভাবে চিবিয়ে কিংবা পিষে না খেলে বাদামকে হজম করা খুবই শক্ত।

চীনাবাদাম—চীনাবাদাম খুবই পুষ্টিকর। কিন্তু হজম করা কঠিন। এজন্য এজিনিষ বেশী খাওয়া ঠিক নয়।

খাবারের সংরক্ষণ—বাইরে পড়ে থাকলে আলো-বাতাস ইত্যাদি লেগে খাবার নষ্ট হয়ে যায়। এজন্য খাবার ভাল রাখতে হলে কতকগুলো নিয়ম মেনে চলতে হয়, যেমন নোনা জলের মাছ ভাল রাখতে হলে তাকে শুকিয়ে নিতে হয়। কিন্তু এতে খাবারের গন্ধ চলে যায়, খেতেও খারাপ হয়ে যায়। মাংস, দুধ, ফল ও সব্জি ঠাণ্ডা যায়গায় রাখলে সাধারণ জায়গার চেয়ে সেগুলো বেশী দিন টাটকা থাকে। এজন্য দেশে আজকাল অনেক বাড়ী তৈরি হচ্ছে যেখানে এসব জিনিষ ঠাণ্ডায় রাখা চলে এবং লোকের দরকারে যে কোন-সময় এগুলি তাদের দেওয়া যায়।

দেহের যত্ন

দেহ ভাল রাখতে হলে পরিষ্কার থাকা, রোজ ব্যায়াম করা, বিশ্রাম ও ঘুম—এগুলোর দিকে নজর দেওয়া দরকার। দেহের যত্ন ঠিকমত না নিলে আমরা যদি ভাল বাড়ীতে থাকি, ভাল আলো-বাতাস পাই, বিশুদ্ধ জল পান করি ও পুষ্টিকর খাবার খাই তবুও আমাদের শরীর ভাল থাকবে না। কাজেই আমাদের শরীর ভাল রাখতে হলে আমাদের দরকার রোজ কতকগুলি কাজের অভ্যাস করা। যে কাজগুলি আমাদের শরীরের অনিষ্ট করবে না বরং ভালই করবে। এই ভাবে চললে আমরা অনেকদিন বেঁচে থাকতে পারব এবং আমাদের সহজে কোন রোগ হবে না।

(১) পরিষ্কার থাকা—শরীর সবসময় পরিষ্কার রাখতে হবে। রোজ ভালভাবে তেল মেখে গা রগড়ে ধুয়ে পরিষ্কার করতে হবে। মাথার চুলেও তেল দিতে হবে। শরীরে মাঝে মাঝে সাবান দেওয়া দরকার। মাসে একবার মাথার চুলে সাবান দিতে হয়, তাহলে মাথায় ময়লা জমতে পায় না। শরীর পরিষ্কার রাখলে কখনও খোস, পাঁচড়া, দাদ, চুলকানি ইত্যাদি হবে না।

শরীরের সংগে সংগে বিছানাপত্র, কাপড়-চোপড়ও পরিষ্কার রাখা দরকার। বিছানা-পত্র, কাপড়-চোপড় ইত্যাদি ময়লা রাখলে শরীর হাজার পরিষ্কার রাখলেও খোস, পাঁচড়া, দাদ ইত্যাদি রোগ হবে। বিছানা-বালিশ মাঝে মাঝে রোদে

দেওয়া দরকার। আর কাপড়-চোপড় কয়েকদিন পর পর ধুয়ে ফেলতে হয়। সাবান দিয়ে না কাচতে পারলে জলকাচা করে নেওয়াও ভাল।

(২) নখ কাটা—নখ একটু বড় হলেই কেটে ফেলতে হয়। নখ বড় হলে নখে ময়লা জমে। সেই ময়লা খাওয়ার সংগে পেটে যায়। ফলে পেটের অসুখ হয়।

(৩) চুল আঁচড়ান—রোজ স্নান করবার আগে চুলে তেল মাখতে হয়। স্নানের পর বুরুশ বা চিরুণী দিয়ে চুল আঁচড়ে ফেলা দরকার। এভাবে আঁচড়ে না ফেললে মাথায় খুব্‌কি ও ময়লা জমবে। ঐ খুব্‌কি ও ময়লা থেকে মাথায় চুলকানি হবে। তাছাড়া মাথায় উকুনও হতে পারে। উকুন রক্ত খাবে এবং রোগের জীবাণু শরীরে ঢুকিয়ে দেবে। উকুন হলে ডি, ডি, টি পাউডার মাথায় মাখা ভাল, তাহলে সব উকুন মরে যাবে।

(৪) দাঁত পরিষ্কার—দাঁত পরিষ্কার করা রোজকার কাজ হওয়া উচিত। দাঁতে ময়লা জমলে সেই ময়লা পেটে গিয়ে পেটের রোগ হতে পারে। খারাপ দাঁতের জন্য অনেক কঠিন কঠিন রোগও হয়। টুথপেষ্ট্‌ আর বুরুশ দিয়ে দাঁত মাজা ভাল। তা না হলে নিমের কিংবা বাবলার দাঁতন ব্যবহার করা যেতে পারে। সরষের তেলের সংগে নুনের গুঁড়ো মিশিয়ে দাঁত মাজলে, দাঁত ও মাড়ি ভাল থাকে। কবিরাজী দাঁতের মাজনও দাঁতের পক্ষে ভাল। দাঁতের গোড়ায় পোকা হলে দাঁতের ডাক্তার দিয়ে তা বের করে ফেলা দরকার। শিশুরা বেশী আংগুল চুষলে তা থেকে মাড়ির অসুখ ও অন্যান্য রোগ

হতে পারে। চিবিয়ে খেতে হয় না এমন জিনিষ বেশী খেলেও দাঁত নষ্ট হতে পারে। চিনি বেশী খেলেও দাঁত খারাপ হয়।

(৫) পা পরিষ্কার রাখা—পথ চলতে গেলে অনেক দূষিত জিনিষ মাড়াতে হয়। ফলে অনেক রোগের জীবাণু পায়ে আটকে যায়। কাজেই বাড়ী ফেরার পর পা ভাল করে না ধুলে ঐ জীবাণুগুলো স্থযোগ পেয়ে দেহে ঢুকে পড়তে পারে এবং রোগ বাধাতে পারে। খালি পায়ে হেঁটে, বাড়ী ফিরেই ভাল করে হাত ও পা ধুয়ে ফেলা দরকার। তাহলে জীবাণুর হাত থেকে কিছুটা রক্ষা পাওয়া যায়।

(৬) চোখ-কানের যত্ন—চোখ ও কানের যত্ন নেওয়া খুবই দরকার। চোখের যদি ভালমত যত্ন না নেওয়া হয় তবে চোখ খারাপ হয়ে যাবে, চোখের দৃষ্টি শক্তি কমে যাবে। এজন্য খুব বেশী বা খুব কম আলোতে পড়া উচিত নয়। সেলাই বা অন্য কোন কাজও এইভাবে করা ঠিক নয়। আলো যেন বাঁ দিক থেকে আসে। বইয়ের অক্ষরগুলি যেন খুব ঘন বা খুব ছোট না হয়। পড়বার সময় বই যেন খুব দূরে বা খুব কাছে না থাকে। কিছুক্ষণ পড়ার পর থামা দরকার। চোখে ময়লা পড়লে চোখ রগড়ান ঠিক নয়। চোখে জলের ঝাপটা দিয়ে চোখ পরিষ্কার করে ধুয়ে নেওয়া ভাল। কয়লার গুঁড়ো চোখে পড়লে পরিষ্কার কাপড় বা রুমালের কোণ তুলির মত গুটিয়ে নিয়ে তারপর চোখের নীচের বা উপরের পাতা উল্‌টে নিয়ে কয়লার গুঁড়ো কোথায় আছে তা খুঁজে বের করে সেই তুলি দিয়ে খুব আস্তে আস্তে কয়লার

গুঁড়োকে বের করে আনতে হয়। পরে চোখে ঠাণ্ডা জলের ঝাপটা দেওয়া ভাল।

চোখ ওঠা একটি রোগ। এই রোগে চোখে বেদনা হয়, চোখ লাল হয়। চোখ পিঁচুটিতে ভরে যায়। তখন আলোর দিকে তাকান যায় না। এই রোগ হলে নীল চশমায় চোখ ঢেকে রাখা ও চিকিৎসা করান দরকার।

কানেও যাতে কোন আঘাত না লাগে সেদিকে লক্ষ্য রাখা দরকার। এজন্য কানে চড় মারা ঠিক নয় কারণ এতে কানের যে পর্দা আছে সেটা নষ্ট হয়ে যেতে পারে এবং শোনবার ক্ষমতাও কমে যেতে পারে।

স্নানের আগে কানে সরষের তেল দেওয়া দরকার। তেল দিলে কানের ময়লা বের হয়ে যায়। কান পাকলে কানে ঔষধ দিতে হয়।

(৭) ব্যায়াম—ব্যায়ামের মানে হল শরীরকে খাটানো। যারা মাথার কাজ বেশী করে তাদের পক্ষে হজমের জন্য রোজ খোলা বাতাসে ব্যায়াম করা দরকার। হাঁটা, দৌড়ানো, খেলা —এগুলো খুব ভাল ব্যায়াম। এগুলো হতে দেহের ও মনের খুব উপকার হয়। শক্তি বাড়াবার ও রোগ হতে না দেওয়ার জন্য ব্যায়ামের দরকার। কিন্তু দুর্বল লোকেরা কঠিন ব্যায়াম করলে তাদের রোগ হতে দেখা যায়। ব্যায়াম রোজ করা ভাল এবং তা ক্রমে ক্রমে বাড়াতে হয়। বেশী খাওয়া, কম খাওয়া, বা কঠোর মাথার কাজের পরে ব্যায়াম করা ঠিক নয়।

(৮) বিশ্রাম ও ঘুম—ব্যায়ামের মতই বিশ্রাম ও ঘুমের দরকার মানুষের খুব বেশী। যখন কোন কাজ করা হয় তখন

শরীরের শকতি-ক্ষয় হয়। বিশ্রামের পর আবার শরীরে শকতি ফিরে আসে। ফলে কাজ করার সুবিধা হয়।

সেই রকম ঘুম ঠিকমত না হলে শরীর খারাপ লাগে, গা ম্যাজ ম্যাজ করে। সেজন্য রোজ নিয়মমত ঘুমন দরকার।

রোজ তেল মেখে স্নান করা, খোলা জায়গায় ব্যায়াম করা, ও বিছানাপত্র রোদে দেওয়া দরকার

যারা খুব ছোট তারা দিন ১২ ঘণ্টা ঘুমোবে। আর সাধারণ লোক দিন ৯ ঘণ্টা ঘুমুবে। রুগ্‌ন ও বৃদ্‌ধদের বেশী ঘুমন দরকার।

রাত্রি ঘুমের পক্ষে ঠিক সময়। শোয়ার ঘরে যেন ভালরকম আলো-বাতাস আসে। বিছানায় ঘুমোন ভাল। শিশুদের

ঘুমুতে দেওয়ার আগে বেশী খেতে দেওয়া বা কঠিন কাজ করতে দেওয়া ঠিক নয়। শিশুদের সংগে বড়দের এক বিছানায় শোয়াও ঠিক নয়।

(৯) হজম—হজম ভাল হওয়া দরকার। শহরের লোকেরা এই হজমের গোলমালে ভোগে। এর কতকগুলো কারণ আছে, যথা, (১) ব্যায়ামের অভাব, (২) ভালমত না খাওয়া, (৩) নিয়ম মেনে না চলা, (৪) কতকগুলো রোগ, যেমন রক্ত নাথাকা, লিভারের রোগ ইত্যাদি। (৫) আফিম, বিড়ি ইত্যাদি বেশীরকম খাওয়া। এই হজমের গোলমালে বারে বারে ভুগলে স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে যাবে।

চিকিৎসা—এর চিকিৎসা হল রোজ খোলা বাতাসে ব্যায়াম। চিনি ইত্যাদি মিষ্টি জিনিষ বেশী না খাওয়া। ফল ও শাক-সব্জি ভালভাবে খাওয়া। রোজকার খাওয়া ঠিক নিয়মে হওয়া দরকার। রোজ সকালে এক গেলাস ঠাণ্ডা জল খাওয়া ভাল। বেশী ভুগলে ডাক্তার দেখান দরকার।

(১০) কাপড়-চোপড়—কাপড়-চোপড় শরীরকে গরম রাখে। জল-হাওয়ার হাত থেকে শরীরকে বাঁচায়। কাপড় আঘাতের হাত থেকেও শরীরকে বাঁচায়। সুন্দর দেখাবার জন্যও কাপড় পরা দরকার। শীতকালের কাপড় বেশ পুরু হওয়া দরকার যাতে এই কাপড় শরীরের গরমকে আটকে রাখতে পারে। পশম ও লোমের কাপড়ই শীতকালে ভাল। অন্যদিকে গরম কালে সূতী কাপড় পরা ভাল। এতে শরীরের ঘাম তাড়াতাড়ি শুকিয়ে শরীর ঠাণ্ডা হতে পারে। যে গুলি দিয়ে বাতাস ঢুকতে পারে সেগুলি গরমকালে পরলে

গরম লাগে। লাল ও কাল রঙের কাপড় বেশী গরম হতে দেখা যায়।

শরীরকে আঘাত, ঠাণ্ডা ও ভেজার হাত থেকে বাঁচাবার জন্য কাপড় এমন ভাবে পরা উচিত নয় যাতে শরীরের কোন অংগের রক্ত চলাচল বাধা পায়। এজন্য কাপড়-জামা হাল্কা ও ঢিলা হওয়া দরকার। কাপড়-চোপড় যেন বুক, পেট, কোমর ইত্যাদি কোন যায়গায় আঁট হয়ে না বসে। জুতোও যেন খুব আঁট না হয়।

শোয়ার সময় দিনের কাপড় বদলে রাতের কাপড় পরা উচিত। রাতের পোষাকও যেন বেশ হাল্কা ও ঢিলা হয়। বিছানার চাদরও যেন হাল্কা ও গরম হয়। ঘুমোবার সময় মুখ ঢাকা দেওয়া খুব খারাপ। এতে একই বাতাস বার বার নাক দিয়ে টেনে নেওয়ায় সেই বাতাস বিষিয়ে উঠে ও শরীরের ক্ষতি করে। বিছানার চারিদিকে চাদর ইত্যাদি ঝুলিয়ে রাখা খারাপ কারণ এতে বাতাস পাওয়া যায় না এবং ধুলো-বালি জমে উঠার সুবিধা পায়।

ভিজা কাপড় সঙ্গে সঙ্গে ছেড়ে ফেলা উচিত। তা না হলে ঠান্ডা লেগে অসুখ করার ভয় খুব বেশী।

কাপড় ধোয়ার দিকে সব সময় ভাল নজর দেওয়া হয় না। ধোবা যে কাপড় কাচে তা হয়ত দূষিত জলে কাচে, সেজন্য ঐ কাপড়ে অনেক রোগের জীবাণু লেগে যায়। লোকে ঐ কাপড় পরে কলেরা, আমাশয়, টাইফয়েড প্রভৃতি রোগে ভোগে। ঠিক এইভাবেই হাম, বসন্ত ইত্যাদি রোগের জীবাণু ধোবার বাড়ীর কাপড় থেকে আসে। এই সব জীবাণু থেকে বাঁচবার উপায় হল ধোবার বাড়ীর কাপড়গুলোকে কয়েক ঘন্টা রোদে রেখে দেওয়া। তাহলে বেশীর ভাগ জীবাণু মরে যাবে।

পল্লীর সাফাই

দেহ ভাল রাখলেই শুধু হবে না, গ্রামের স্বাস্থ্যও ভাল রাখতে হবে। তা না হলে দেহের যত্ন যতই নেওয়া হোক না কেন রোগে পড়বার ভয় যাবে না। সেজন্য সকলে মিলে মাঝে মাঝে পল্লী সাফাই করা দরকার।

গ্রামের লোক দলে দলে ভাগ হয়ে গিয়ে পুকুরের ধার, কুয়ার পাড়, গ্রামের নালা, ছোট ছোট ঝোপ জংগল ও পথ ইত্যাদি পরিষ্কার করবে। কেউ মাটি দিয়ে ছোট ডোবাগুলিকে ভরাট, কেউ বড় ডোবায়, পুকুরে ও কূয়ায় পটাশ ইত্যাদি ঔষধ ছড়িয়ে দেবে যাতে জল বিশুদ্ধ হয়। ঔষধ ছড়িয়ে দেবার পর কয়েকদিন সেই জল যাতে ব্যবহার না করা হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। পথ মেরামতের দরকার থাকলে সেগুলি মেরামত করে ফেলবে।

বাড়ীর আশে-পাশে যেন ময়লা জমতে না পায় সেদিকে নজর রাখতে হবে। বাড়ীর সামনে ও পিছনের যে জংগল তা যেন বাড়ীর লোকেরাই পরিষ্কার করে। বাড়ীর নালাও যেন তারাই পরিষ্কার করে। কিন্তু শুধু বললেই হবে না, কাজ ঠিকমত হচ্ছে কিনা তা দেখতে হবে। যদি কাজ ঠিকভাবে না হয় তবে তাতে হাত লাগাতে হবে।

কারণ বাড়ীর ময়লা যদি ঠিকমত না পরিষ্কার হয়, সেগুলি যদি বাড়ীর মধ্যেই জমা হয় তাহলে তা থেকে খারাপ গন্ধ আসে। নানারকম পোকা-মাকড় তা থেকে জন্মাবে এবং

রোগ ছড়াবে। এজন্য বাড়ীর ময়লা রোজ পরিষ্কার করা দরকার।

বাড়ীর ময়লা সচরাচর তিন রকমের হয় ঃ—

(১) পায়খানার ময়লা, যথা—মল, মূত্র ইত্যাদি।
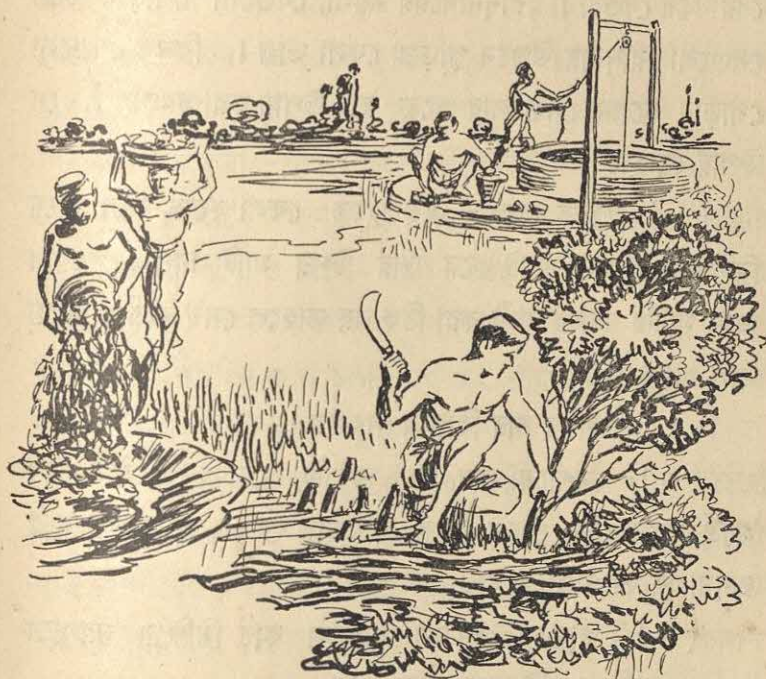
পল্লীর সাফাই

(২) রান্নাঘরের ময়লা, যথা—ছাই, পাতা, ঘরের ধুলো, ভাতের ফেন, তরকারীর খোসা, পচাফল, সব্জি ইত্যাদি।

(২) বাড়ী পরিষ্কারের নোংরা জল, স্নানের ও রান্নার জল।

এইসব ময়লাকে বাড়ীর কাছাকাছি কোথাও জম্‌তে দেওয়া

ঠিক নয়। এজন্য বাড়ীর আশ-পাশ ও পথ রোজ ঝাঁট দিতে হবে। রান্না ঘরের ময়লা পথের ধারের গোলাকার বা ঢাকনি-ওয়ালা পাত্রে ফেলা দরকার। এইসব ময়লা নষ্ট করার দুরকম উপায় আছে, এক পুড়িয়ে ফেলা, নয় জল দিয়ে ভালভাবে ধুয়ে বের করে দেওয়া। রান্নাঘরের ময়লা, যেগুলো পোড়ান চলে সেগুলো রান্নার উনুনে পুড়িয়ে ফেলা ভাল। কিন্তু যেগুলো পোড়ান চলেনা সেগুলোর জন্যে অন্য উপায় করা দরকার। সে উপায় হচ্ছে ঃ—

(১) পুতে ফেলা—এই পুতে ফেলা হচ্ছে ময়লা দিয়ে নিচু জমি বা গর্ত্ত ভরাট করে তার উপর মাটি চাপা দেওয়া। এই মাটির উপর বাড়ী করা ঠিক নয় তাহলে সেই বাড়ীর স্বাস্থ্য ভাল থাকে না

(২) জমির সার হিসাবে ব্যবহার।

(৩) মেশানো সার, পচা সব্জি, গোবর ইত্যাদি এক গর্তে অনেকদিন রেখে দিলে ভাল সার হয়। এতে মশা-মাছি জন্মাবার ভয়ও থাকে না।

(৪) আগুনে পোড়ান শুকনো কাঠ মিশিয়ে ময়লাকে আগুনে পুড়িয়ে ছাই করে ফেলা ভাল।

পায়খানা এমনভাবে তৈরী করা উচিত যাতে তার গামলা থেকে বসবার যায়গা বেশ উঁচুতে হয়। পায়খানার ভিতরে যেন বেশ ভালরকম আলো বাতাস খেলে। পায়খানার মল ও মূত্র যেন দুটো আলাদা যায়গায় পড়ে, এক যায়গায় মিশে খারাপ গন্ধ না ছড়ায়। মেথর যেন রোজ পায়খানার মল পরিষ্কার করে। সেই মল হয় জমিতে সার দেবার জন্য নিয়ে যাবে, নয় পুড়িয়ে

ফেলবে। পায়খানার ভিতরটা মাঝে মাঝে পরিষ্কার করে, ঔষধ ছড়িয়ে দেওয়া ভাল।

জমিতে সার দেওয়ার জন্য মল ব্যবহারের উপায় হল জমির মধ্যে খানিকটা গর্ত করে মল পুতে রাখা। তিনমাস পরে সেই জমিতে লাঙল দিয়ে বীজ ধান পুততে হবে। এই রকম জমি থেকে বাড়ী যেন খানিকটা দূরে থাকে, না হলে মাছির উপদ্রব হবে। গর্ত না খুড়ে জমির মধ্যে ময়লা ফেলাও খারাপ।

কূয়া পায়খানা—একটি কূয়ো খুঁড়ে তার উপরে ছোট ঘর তৈরী করে সেখানে মল-মূত্র ত্যাগ করা হয়। সব ময়লা কূয়োর জলের ভিতর পড়ে ও মিশে যায়। এই পায়খানা পরিষ্কার রাখা কঠিন। কাজেই এগুলো বাড়ী থেকে কিছুটা দূরে হওয়া দরকার। কিছুদিন কাজ চলার পর এই পায়খানা ভরিয়ে দিতে হয়। এগুলি বাড়ী থেকে দূরে হওয়া ভাল।

গর্ত পায়খানা—বাড়ী থেকে দূরে একটা গর্ত খুঁড়ে তাতে মল ত্যাগ করা হয়। মল ত্যাগের পরে সেই পায়খানা মাটি বা ছাই চাপা দেওয়া হয়। একটা পায়খানা ভরাট হয়ে গেলে অন্য যায়গায় পায়খানা তৈরী করতে হয়। গ্রামের পক্ষে এগুলি ভাল।

আগুনে পোড়ান—ময়লা আগুনে পোড়াবার জন্য ভাল চুল্লী দরকার। গুঁড়ো ছাই জমা হবার জন্য চুল্লীর ভিতর যেন ভালরকম যায়গা থাকে।

ময়লা পুড়িয়ে ফেলার অসুবিধা হচ্ছে এই যে তার জলের ভাগটা পোড়ান চলে না ও ময়লা থেকে খুব বেশী ধোঁয়া ও গন্ধ বেরোয়। ময়লা পোড়াবার সময় ভালভাবে দেখাশোনা করা দরকার।

জল দিয়ে ভালভাবে ধুয়ে বের করে দেওয়া—বড় বড় শহরে

অনেক পায়খানা আছে যেখানে ময়লা, জল দিয়ে ধুয়ে, মাটির নীচেকার নালা দিয়ে বেরিয়ে যায়। ময়লা পরিষ্কারের এই হচ্ছে সব চেয়ে ভাল উপায়।

এই সব পায়খানায় দেওয়ালের গায়ে একটি জলের পাত্র লাগান থাকে। ঐ জল দিয়ে মলের পাত্রের মল ধুয়ে নালা দিয়ে বেরিয়ে গিয়ে মাটির তলাকার নালায় মেশে। সেই মাটির তলাকার নালা দিয়ে ঐ মল শহরের বাইরে গিয়ে পড়ে। এই মাটির তলাকার নালা দিয়ে মল চালান করার কাজ ভালভাবে চলে যদি বেশীরকম জল পাওয়া সুবিধা থাকে। এভাবে ময়লা সরিয়ে ফেলার কাজ অনেক বড় শহরে চালু আছে, আরও অনেক শহরে এ কাজ চালু হওয়া দরকার।

মল-শোধক পায়খানা ও স্নানের যায়গা আজকাল অনেক শহরে দেখা যায়। যেখানে ভালরকম জল পাওয়ার সুবিধা আছে সেখানে এ ব্যবস্থা ভাল। শহরের পথের ধারে যদি এইরকম পায়খানা তৈরী করা যায়, তাহলে পথের কোনা ও নালা মূত্র ত্যাগ ইত্যাদির দ্বারা কম নোংরা হবে।

মাটির তলার নালার ময়লা ফেলার জায়গা :—

মাটির তলার নালার ময়লাগুলি ফেলা নিয়ে খানিকটা গোলমাল আছে। এ থেকে অনিষ্ট হবার ভয়ও আছে। এজন্য এগুলো ফেলবার কতকগুলো যায়গা ঠিক করা হয়েছে :—

(১) বোম্বাই ইত্যাদি শহরে এগুলি সাগরে ফেলা হয়।

(২) অন্য শহরে এগুলি নদী বা দীঘিতে ফেলা হয়।

কিন্তু এটা সবসময় ঠিক নয়। এভাবে জল দূষিত হওয়ার জন্য কলেরা, টাইফয়েড প্রভৃতি রোগ হতে পারে।

(৩) জমিতে জল দেওয়া।

জমিতে জল দেওয়ার জন্যও অনেক সময় এই মাটির তলার নালার ময়লা জল নিয়ে যাওয়া হয়। এই জল পেলে জমির ফসল খুব তাড়াতাড়ি বেড়ে উঠে। কিন্তু এজন্য ভালরকম নালা থাকা দরকার।

(৪) শোধন করে নেওয়া।

ময়লা শোধন করে নেওয়ার জন্য সচরাচর চূণ ব্যবহার করা হয়। শোধন করে নেওয়ার পর ময়লা অনেক সময় সার হিসাবে ব্যবহার হয়। নয়তো তাকে পুড়িয়ে ফেলা হয় অথবা সাগরের জলে ফেলার ব্যবস্থা করা হয়।

(৫) মল-শোধক উপায়।

মল শোধন করবার জন্য ঔষধ মিশিয়ে কঠিন মলকে তরল করা হয়। মল রাখার জন্য একটি চৌবাচ্চা করা হয়। ঔষধের দ্বারা সেই মলের ভিতর নড়া-চড়া হতে থাকে, ভিতর থেকে বারে বারে বুদ্বুদ্ উঠতে থাকে; তার ফলে উপরে ময়লা যে সর পড়ে সেটা ছিঁড়ে যায়। এভাবে বার কতক নড়া-চড়ার ফলে তরল মলের ভিতর যে কুটি কুটি মল থাকে, সেগুলি গলে যায়। সব ময়লা তরল হয়ে পড়ে।

এভাবে ময়লা তরল করার সময় চৌবাচ্চা থেকে যে বাতাস বেরোয় তা দিয়ে আগুন জ্বালান চলে।

যদিও এই ময়লায় গন্ধ থাকে না এবং এটা পরিষ্কারও তবুও এই ময়লা নদীতে ছাড়লে অনেক অনিষ্ট হতে পারে। এজন্য এগুলি জমিতে সার হিসাবে দেওয়ার ব্যবস্থা করা ভাল।

ছোঁয়াচে রোগ

ভারতবর্ষে বেশির ভাগ লোক মরে ম্যালেরিয়া, কলেরা, বসন্ত, যক্ষ্মা ইত্যাদি রোগে। এই সব রোগ হয় জীবাণু থেকে, এবং লোকে যদি শেখে যে এদের হাত থেকে রেহাই পেতে হলে কি কি করতে হবে তা হলে এসব রোগ অনেক কমে যাবে।

রোগীর মল-মূত্র, থুথু, কাসি, কফ ইত্যাদির মধ্যে রোগের জীবাণু থাকে। এগুলি আবার ঠাণ্ডা যায়গায় বেশীদিন বাঁচে। স্যেঁত স্যেঁতে ও অন্ধকার জায়গা হলে খুবই ভাল হয়। তারপর সে সব জায়গা থেকে তারা সুস্থ মানুষের শরীরে গিয়ে ঢোকে।

জীবাণু মানুষের শরীরে ঢোকে তিন দিক দিয়ে।

(১) চামড়ার ভিতর দিয়ে

(২) নিঃশ্বাসের সংগে

(৩) খাবারের সংগে

চামড়ার ভিতর দিয়ে যে সব রোগের জীবাণু শরীরে ঢোকে সেগুলো হল পাঁচড়া, দাদ, ম্যালেরিয়া প্রভৃতি। এগুলোর কোনটা হয় রোগীকে ছোঁয়ার জন্য আর কোনগুলি হয় মশা, ছারপোকা ইত্যাদির কামড়ের থেকে।

নিঃশ্বাসের সংগে যে সব রোগের জীবাণু শরীরে ঢোকে সেগুলো হল যক্ষ্মা, ডিপ্‌থিরিয়া প্রভৃতি রোগ। এগুলি ধূলা-বালির মধ্যে মিশে থাকে এবং নিঃশ্বাসের সংগে শরীরে গিয়ে ঢোকে।

আর খাবারের সংগে যে সব রোগের জীবাণু শরীরে ঢোকে

সেগুলো হল, কলেরা, টাইফয়েড, আমাশয় প্রভৃতি রোগ। মাছি, জল এবং জলের মতই ঐ ধরণের কোন জিনিষ দিয়ে খাবার বিষিয়ে দিলে সেই খাবার খেয়ে এই সব রোগ হয়।

কিন্তু রোগের জীবাণু শরীরে ঢুকলেই যে রোগ হবে তার কোন মানে নেই। আমাদের শরীরে একটা শক্তি আছে যা দিয়ে রোগের জীবাণুকে ঠেকান চলে। সেই শক্তি কারও দেহে বেশী থাকে আবার কারও দেহে কম থাকে। জীবাণু শরীরে ঢুকলেই সেই শক্তির সংগে লড়াই বাধে। জীবাণু যদি বেশী হয় তবে রোগ ঠেকাবার শক্তি হেরে যায় আর জীবাণু যদি সংখ্যায় কম হয় তবে রোগ ঠেকাবার শক্তি জিতে যায়। এই রোগ ঠেকাবার শক্তি হচ্ছে রক্তের সাদা কণা। সাদা কণারা লড়াইয়ে হেরে গেলে তবেই দেহে রোগ দেখা দেয়।

রোগ ঠেকাবার শক্তি বাড়াবার জন্য আজকাল ডাক্তারেরা সুস্থ মানুষের দেহে "ইন্জেকসন" দেন। কলেরা, টাইফয়েড, বসন্ত প্রভৃতি রোগে এই "ইন্জেকসনের" খুব চলতি। আজ-কাল যক্ষ্মা রোগ ঠেকাবার জন্যও এইরকম "ইনজেকসন" দেওয়া চলছে।

রোগের জীবাণু শরীরে ঢোকামাত্রই যে রোগ হবে তা নয়। রোগের জীবাণু রক্তের মধ্যে সংখ্যায় বেশী বেড়ে না ওঠার আগে শরীরে রোগের লক্ষণ দেখা যায় না।

এই তো গেল রোগ হওয়ার কথা, এবার বলব এই জীবাণুর হাত থেকে রেহাই পাওয়ার উপায়। আগেই বলা হয়েছে জীবাণুরা ঠাণ্ডা, ভিজা ও অন্ধকার জায়গায় থাকতে ভালবাসে। সূর্য্যের আলো ও বাতাস এদের শত্রু; কাজেই ঘরে যদি

ভালরকম রোদ ও বাতাস আসতে পায় তবে রোগের জীবাণু মরে যাবে। বাড়ী-ঘর মাঝে মাঝে পরিষ্কার করে সেখানে 'ডি, ডি, টি'র গুঁড়ো ছড়িয়ে দিলেও জীবাণু মরে যাবে। আর বাড়ীর কাছে যেন পচা জীব-জন্তুর দেহ কিংবা অন্য কোনরকম ময়লা জমে থাকতে না পায়। তা না হলে ঐ সব জিনিষ থেকে জীবাণু মানুষের শরীরে ঢুকবে!

ম্যালেরিয়া

ম্যালেরিয়া একটি রোগ এবং মশা এর জীবাণু রুগ্ন লোকের শরীর থেকে সুস্থ লোকের শরীরে নিয়ে যায়। ম্যালেরিয়ার লক্ষণ হল কেঁপে জ্বর আসা এবং ঘাম দিয়ে জ্বর ছেড়ে যাওয়া। বার বার এই রোগে ভুগলে রক্ত-শূন্যতা, পিলে বেড়ে যাওয়া, দুর্বলতা ইত্যাদি হতে পারে।

ম্যালেরিয়ার জীবাণু রক্তের লাল কণার মধ্যে থাকে এবং সেখানে সংখ্যায় বেড়ে চলে। এর ফলে লাল কণাটি ফেটে যায় ও রক্ত জীবাণুতে বিষিয়ে উঠে। যার রক্ত জীবাণুতে বিষিয়ে গেছে এমন একজন লোককে "এনোফিলিশ" মশা কামড়ালে সেই রুগীর রক্ত থেকে ম্যালেরিয়ার বিষ মশার শরীরে চলে যায়। সেখানেও সেই বিষ সংখ্যায় বাড়তে থাকে। তারপর সেই মশা কোন সুস্থ লোককে কামড়ালে সেই বিষ মশার দেহ থেকে সুস্থ লোকের দেহে গিয়ে ঢোকে ও তার রক্তে মিশে যায়। এভাবে লোকের ম্যালেরিয়া রোগ হয়।

মশা যেসব জায়গায় আছে সে সব যায়গায় ম্যালেরিয়া রোগ হতে দেখা যায়, অন্য জায়গায় হয় না। কাজেই আমরা যদি

মশা তাড়াবার ভালব্যবস্থা করতে পারি তবে ম্যালেরিয়া আর হবে না।

মশারা দলে দলে বদ্ধ জলে ডিম পাড়ে। জল যদি কোথাও সরে যাবার ব্যবস্থা না থাকে তাহলে ডিমগুলি থেকে সেখানে বাচ্চা হয় এবং বাচ্চারাও সেখানে জীবনের প্রথম দিকটা কাটায়। কাজেই ম্যালেরিয়া তাড়াবার প্রথম উপায় হচ্ছে কোথাও জল জমে থাকতে না দেওয়া, যদি কোথাও বদ্ধ জল থাকে তবে তা নালা কেটে বের করে দেওয়া। অন্য উপায় হচ্ছে জলে কেরাসিন তেল বা 'ডি, ডি, টি'র গুঁড়া ছড়িয়ে দেওয়া। এর ফলে জলের উপর একটা পুরু সর পড়ে যায়, যার জন্য মশার ডিম ও বাচ্চারা জলের ভিতর থেকে নিঃশ্বাস নিতে পারে না। ফলে তারা মারা পড়ে। জলে একধরণের মাছ ছেড়ে দেওয়া ভাল, যারা মশার ডিম খায়। তারা সুযোগ পেলেই ডিমগুলিকে খেয়ে ফেলবে।

উড়বার ক্ষমতা পেলেই মশার বাচ্চারা জল থেকে উড়ে যায়। তখন তারা ঘরের কোনা, ঝোপ-জংগল ও কাপড়-চোপড়ের মধ্যে গিয়ে লুকোয়। তাদের মারার উপায় হল কেরাসিন তেল বা তরল 'ডি, ডি, টি' সেই সব জায়গায় ছিটিয়ে দেওয়া।

এনোফিলিস মশা রাত্রিতে বেরোয় কাজেই তাদের কামড়ের হাত থেকে রেহাই পাবার উপায় হল শোয়ার সময় মশারির ভিতর শোয়া। ম্যালেরিয়ার হাত থেকে রেহাই পাওয়ার উপায় হল নিয়ম মত "প্যালুড্রিন" খাওয়া। ছেলেরা বড়দের তুলনায় কম পরিমাণে "প্যালুড্রিন" খাবে।

বসন্ত

বসন্ত খুব ছোঁয়াচে রোগ। প্রতি বছর আমাদের দেশের অনেক জায়গায় এ রোগ দেখা যায়। জীবাণু হতে এ রোগ হয়। এ রোগেরও লক্ষণ কেঁপে জ্বর আসা। রোগীর চোখ-মুখ লাল হয়ে উঠে। মাথায়, ঘাড়ে, ও কোমরে বেদনা হয়। তিন দিনের দিন রোগীর কপালে, ঘাড়ে ও হাতের কব্‌জীতে লাল গুটি দেখা দেয়। পরে শরীরের অন্য জায়গায় গুটিগুলো ছড়িয়ে পড়ে। পাঁচ-ছয় দিনের মধ্যেই গুটিগুলি জলে ভরে যায় এবং সাত, আট দিনে গুটিগুলি পাকে ও পুঁজ হয়। ক্রমে গুটিগুলি হতে ঘা হয়ে যায় এবং শুকাবার সময় ওদের উপর মামড়ি পড়ে।

রোগীর নাকের ও মুখের কফ ও থুথুতে, গুটির রসে বা মামড়িতে, রোগীর বিছানা, কাপড় প্রভৃতি জিনিষে ও যারা রোগীর সেবা করে তাদের জামা-কাপড়ে বসন্তের জীবাণু লেগে যায়। সুস্থ মানুষে ঐ সব জিনিষ ছুঁলে তাদের ঐ রোগ হয়। মশা, মাছি, বাতাস প্রভৃতি দ্বারাও বসন্ত রোগ ছড়ায়।

প্রতি বছর বসন্তের টিকা নিলে এই রোগ হয় না। একবার টিকা নিলে তার রোগ ঠেকাবার ক্ষমতা ২।৩ বছর থাকলেও প্রতি বছর টিকা নিলে ভাল হয়। শিশু জন্মিবার ৬ মাসের মধ্যেই টিকা দেওয়া উচিত। এছাড়া আরও কতক বিষয়ে সাবধান হলে এ রোগ ছড়াতে পায় না। বসন্ত রোগীকে কোনও হাস্‌পাতালে পাঠান ভাল অথবা বাড়ীর কোনও আলাদা ঘরে মশারির মধ্যে রাখা ভাল। যতদিন মামড়ি উঠবে ততদিন সকলে রোগীর ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে চলবে। মামড়িগুলি সাবধানে

জড় ক'রে পুড়িয়ে ফেলবে বা কোন জীবাণু নষ্ট করার ঔষধে ডুবিয়ে রাখবে। রোগীর জামা-কাপড় ভাল করে শোধন করে নিলেও রোগ ছড়িয়ে পড়তে পারবে না।

কলেরা

কলেরা রোগ এক রকমের জীবাণু থেকে হয়। খাবার ও জলের সংগে এই জীবাণু মানুষের পেটে ঢুকলে এই রোগ হয়।
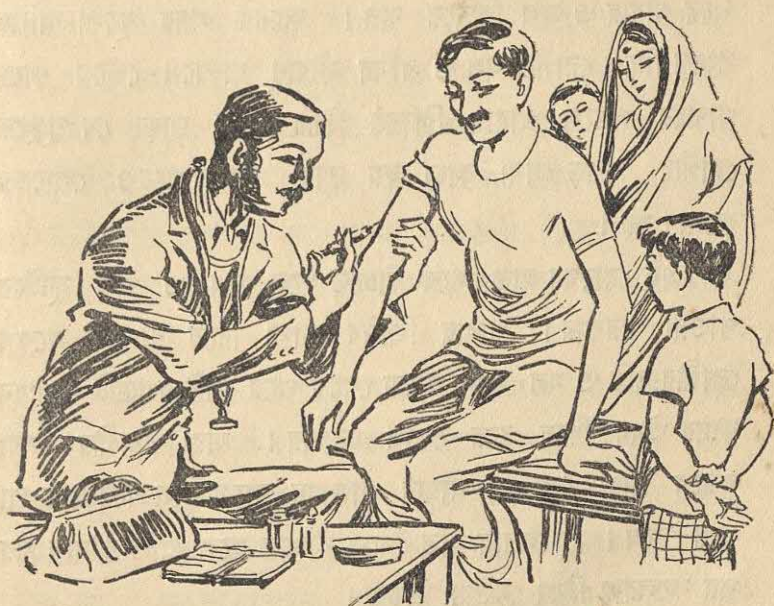
প্রতি ছ'মাস পর পর কলেরার টিকা নেওয়া উচিত

এই রোগের স্বরুতে চাল ধোয়া জলের মত দাস্ত হয় ও তার সংগে বমি হতে থাকে। অল্প সময়ের মধ্যে রোগীর চোখ বসে যায়। গলার আওয়াজও বসে যায়। মূত্র খুব কম হয় অথবা একেবারেই হয় না। হাত-পা ঠান্ডা হয়ে আসে ও

হাতে-পায়ে খিল ধরে। পরে জ্বর হয়। রোগী খুব দুর্বল হয়ে পড়ে। এই সময় রোগীর বমি, মল, থুথু প্রভৃতিতে অনেক জীবাণু থেকে যায়। জীবাণু শরীরে ঢোকার পর কয়েক ঘন্টা হতে চার পাঁচ দিনের মধ্যেই রোগের লক্ষণ দেখা দেয়।

মাছি, পিঁপড়া ও অন্যান্য পোকা-মাকড়ের দ্বারা কলেরা রোগ ছড়িয়ে পড়ে। এরা রোগীর মল-মূত্র প্রভৃতিতে বসলে এদের গায়ে কলেরা রোগের জীবাণু লেগে যায়। এদের দ্বারাই পরে খাবার ও জল বিষিয়ে যায়। অনেক সময় ধূলো-বালির সংগে মিশে রোগীর মল ও বমির জীবাণু বাতাসে ভেসে গিয়ে খাবারে পড়লে খাবার বিষিয়ে উঠে। এ ছাড়া যে পুকুরে রোগীর কাপড়-জামা কাচা হয় তার জল খেয়েও লোকের কলেরা হয়।

এই রোগের হাত থেকে বাঁচতে হলে দুধ ও জল ফুটিয়ে খাওয়া দরকার। খাবার জিনিষ চাপা দিয়ে রাখতে হবে। রোগীর বমি ও মল কোন পাত্রে রেখে পরে সেই পাত্রটি শোধন করার ঔষধ দিয়ে ধুয়ে ফেলা দরকার। যারা রোগীর সেবা করবে তারা জল বা খাবার খাওয়ার আগে ভালভাবে হাত-পা ধুয়ে নেবে। কলেরার হাত থেকে বাঁচতে হলে প্রতি ছ'মাস পর পর কলেরার টিকা নেওয়া উচিত।

দুর্ঘটনা ও তার প্রথমের চিকিৎসা

দুর্ঘটনা মানুষের জীবনে প্রায়ই ঘটে। কাজেই দুর্ঘটনার জন্য আগে থকে তৈরী থাকলে আহত লোকটির অনেক উপকার করা যায়, এমন কি তাকে বাঁচানোও যায়। দুর্ঘটনার পরই লোকটির কিছু চিকিৎসা করতে হয় তা না হলে বিপদ আসতে পারে। এজন্য ডাক্তার আসার আগেই যাতে লোকটির প্রথমের চিকিৎসা হয় তা দেখা দরকার। বাড়ীতে খানিকটা পরিষ্কার কাপড়, তুলো, একটা কার্বলিক সাবান, সূতা, কাঁচি, সেপ্‌টিপিন, খানিকটা টিংচার আয়োডিন, বেনজিন, বোরিক এসিড ইত্যাদি জোগাড় করে রাখা দরকার। দুর্ঘটনা ঘটলে পরে, প্রথমে কি ভাবে চিকিৎসা করা দরকার তার কথা নীচে বলা হল ঃ—

আগুনে পোড়া—কাপড়ে আগুন লাগলে ছুটা-ছুটি করা ঠিক নয়। সম্ভব হলে কাপড়-জামা খুলে ফেলা উচিত। যদি তার সময় না থাকে তাহলে কোন ভারী জিনিষ যেমন, লেপ, চট, মোটা কাপড় ইত্যাদি চাপা দিলে আগুন বাতাস না পেয়ে নিবে যায়। আগুনেপোড়া যায়গায় জল বা বাতাস লাগান ঠিক নয়। সামান্য পুড়ে গেলে গরম ঘি বা নারকেল তেলের পটি দিলে যন্ত্রণা কিছু কমে। বেশী পুড়ে গেলে অল্প গরম জলে এক চামচ খাওয়ার সোডা ও কিছু বোরিক এসিড মিশিয়ে তা দিয়ে পোড়া জায়গাটা ভিজিয়ে রাখতে হয়। ফোস্‌কা পড়লে তা কখনও গেলে দিতে নেই। পরে দরকার হলে ডাক্তার ডাকতে হয়।

মচ্‌কানি বা হাড়-ভাংগা—অনেক সময় হাত বা পায়ের জোড়ের যায়গা মচ্‌কিয়ে যায় এবং শরীরের ভিতরকার জোড়ের যায়গা পেশী দোমড়ানোর জন্য বেড়ে যায়। অনেক সময় জোড়ের জায়গার ভিতরের ছোট ছোট শিরা ছিড়ে গিয়ে রক্ত পড়ে। তার ফলে ঐ জোড়ের যায়গায় জলের মত জিনিষ জমা হতে থাকে এবং ঐ জায়গায় ফুলে উঠে খুব বেদনা হয়। ঐ জায়গা সাথে সাথে বেঁধে দেওয়া দরকার তা হলে বেশী ফুলবার ভয় থাকবে না। ঐ যায়গায় যাতে ভালভাবে রক্ত চলাফেরা করতে পারে তার জন্য মালিশ করিয়া দেওয়া ভাল। ভিতরকার হাড়ের কোন ক্ষতি হয়েছে কিনা তা ভিতরকার ছবি তুলে দেখা দরকার। রোগী সুস্থ হলে ঐ জায়গাটি আস্তে আস্তে নাড়াবার চেষ্টা করতে হবে, তা না হলে জায়গাটি শক্ত হয়ে যেতে পারে।

অনেক সময় পড়ে যাওয়ার জন্য ভিতরকার হাড় ভেংগে যায়। এই অবস্থায় কোন ভাল ডাক্তারের কাছে রোগীকে নিয়ে যেতে হয় অথবা কাছাকাছি হাসপাতালে রোগীকে নিয়ে যেতে হয়। রোগীকে বেশী নড়াচড়া করতে দেওয়া ঠিক নয়। হাতে আঘাত লাগলে হাতটি একটি কাপড় দিয়ে বেঁধে গলার সাথে ঝুলিয়ে দেওয়া দরকার। একটা লম্বা কাঠের টুকরোর সাথে ভাংগা যায়গা বেঁধে দিলেও ভাল হয়।

কেটে যাওয়া বা রক্ত-পড়া—দেহের কোন জায়গা কেটে গেলে ঘা হয়। বাতাসের বা ধুলো-বালির সাথে অনেক জীবাণু এসে ঐ ঘায়ে লাগে এবং ঘা বিষিয়ে দেয়। এজন্য প্রথম থেকে সাবধান হওয়া দরকার। সামান্য কেটে গেলে জায়গাটা

ভালভাবে পরিষ্কার করে টিংচার আয়োডিন লাগিয়ে একটুকরো পরিষ্কার কাপড় দিয়ে বেঁধে দিতে হবে। এতে ঐ জায়গায় জীবাণু লাগতে পারবে না এবং রক্ত পড়াও বন্ধ হবে। বেশী কাটলে রক্ত পড়া বন্ধ করা দরকার। কাটা জায়গার উপর একটি পরিষ্কার কাপড় ভাঁজ করে চেপে ধরলে রক্ত পড়া বন্ধ হয়। কাটা যায়গার উপর ও নীচে চেপে ধরলেও অনেক সময় ভাল ফল পাওয়া যায়। ধমনী কাটলে উপরের দিকে এবং শিরা কাটলে নীচের দিকে তাগা বেঁধে দিতে হয়। এতে রক্ত পড়া বন্ধ হয়। রক্ত পড়া বন্ধ হলে বাঁধা খুলে দিতে হয়। সংগে সংগে ডাক্তারকে খবর দেওয়া দরকার।

জলে ডোবা ও কৃত্রিম শ্বাসের কাজ—জলে ডুবে গেলে লোকের দম বন্ধ হয়ে মারা যায়। কাজেই যত তাড়াতাড়ি হয়, জলে ডোবা লোকটিকে জল থেকে তুলে, তার গলায় আংগুল দিয়ে মুখের ভিতরটা পরিষ্কার করে দিতে হয়। তারপর লোকটির মাথা নীচু করে পা দুটোকে উপর দিকে উঠিয়ে দেহটিকে ঝুলিয়ে রাখলে ভিতরকার কিছুটা জল বের হয়ে যায়। এছাড়া রোগীকে মাটিতে উপুড় করে শুইয়ে তার বুকের নীচে একটি পাতলা বালিশ বা জামা জড়িয়ে মাথাটিকে এমন ভাবে রাখতে হয় যাতে মাথাটি একটু নীচু হয়ে পাশের দিকে বেঁকে যায়। এবার কেহ রোগীর দুপাশে পা দিয়ে তার মাথার দিকে মুখ করে বসবে। ও হাঁটু গেড়ে রোগীর শেষ পাঁজরার নীচের দিকে দুই হাত দিয়ে একসাথে জোরে চাপ দিয়ে এগিয়ে যাবে। হাত বুকের পাঁজরার শেষের দিকে এসে পৌঁছলে আবার হাত উঠিয়ে শেষ পাঁজরার আগের মত চাপ দিয়ে নীচের দিক থেকে

হাতকে উপরের দিকে এগিয়ে আনতে হবে। মিনিটে দশবার করে এভাবে আধঘণ্টা চালালে রোগীর মুখ দিয়ে বাতাস ও জল বেরিয়ে আসবে এবং শ্বাসের কাজ সুরু হবে।

কাঁকড়া-বিছা, মৌমাছি, ভীমরুল ইত্যাদি কামড়ান—এরা আসলে কামড়ায় না, হুল ফোটায়। এদের দেহের শেষের দিকে হুলের মধ্যে একরকম বিষ থাকে। এই বিষ শরীরের কোথাও লাগলে খুব যন্ত্রণা হয়। প্রথমেই এক বড় চাবির গর্তের দ্বারা ঐ যায়গা চেপে ধরতে হবে। এতে হুলটি উঠে আসবে। তারপর ঐ জায়গায় গরম জল, বরফ, চুন, কার্বলিক এসিড প্রভৃতি যে কোন একটি লাগালে যন্ত্রণা কমে যাবে।

সাপে কামড়ান—দুই রকমের সাপ দেখতে পাওয়া যায়, যাদের বিষ আছে আর যাদের বিষ নেই। যাদের বিষ আছে সেই সব সাপের উপরের চোয়ালের মধ্যে দাঁতের সারির উপর বিষের থলি থাকে। থলির মুখ সরু হয়ে বিষদাঁতের গোড়ার সংগে জোড়া থাকে। সাপ কামড়ালে ঐ থলি হতে গলা বিষ দাঁতের গর্ত দিয়ে বাইরে আসে ও শরীরে ঢোকে। বিষধর সাপে কামড়ালে দুটো দাঁতের দাগ দেখা যায়। সাপে কামড়ালে ভয়ে অস্থির হওয়া ঠিক নয়। কামড়ের জায়গাটার উপর দড়ি দিয়ে দু-তিনটে শক্ত বাঁধন দিতে হবে যাতে রক্ত চলা-ফেরা করতে না পারে। তা হলে বিষ শরীরের মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে পারে না। কামড়ানো জায়গাটার চার দিকে অল্প গর্ত করে কেটে দিলে রক্তের সংগে সাপের বিষ খানিকটা বের হয়ে আসবে। এর পর আর দেরি না করে ডাক্তার ডাকিয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে।

পাগলা কুকুরে কামড়ান—পাগলা কুকুরের কামড়ে বিপদ খুব বেশী। ওদের লালাতে একরকমের জীবাণু থাকে ; তার দ্বারা কুকুরে কামড়ান লোকের রক্ত বিষিয়ে গিয়ে "জলাতংক" রোগ হয়। এই রোগের লক্ষণ চার থেকে ছয় সপ্তাহের মধ্যে ফুটে উঠে। এর বড় লক্ষণ হল জল দেখে ভয় পাওয়া।

সাথীরা উচিতমত বাঁধন দিয়ে রোগীর জন্য চিকিৎসক আনিয়েছে

জলের পাত্র কাছে আনলেই রোগী ক্ষেপে উঠে। "জলাতংক" রোগ হওয়া কুকুরের চোখ লাল হয়, মুখ থেকে লালা গড়ায় ও পিছনের পা দুটো পড়ে যায়। এই রোগ হওয়ার আট দশ দিনের মধ্যেই কুকুরটা মারা পড়ে। এজন্য কুকুরে কামড়ালে তার দেহে ঐ সব লক্ষণ দেখা যায় কিনা তা দেখার জন্য দশদিন কুকুরটাকে বেঁধে রেখে তাকে ভালভাবে দেখা উচিত।

প্রথমের চিকিৎসা হিসাবে কামড়াবার জায়গাটা ভালভাবে ধুয়ে সেখানে টিংচার আয়োডিন বা কার্বলিক এসিড লাগাতে হবে। আজকাল "জলাতংক" রোগের ইন্‌জেক্‌সন বেরিয়েছে। দুই সপ্‌তাহ ধরে এই ইন্‌জেক্‌সন নিলে শরীরের "জলাতংক" রোগের জীবাণু মারা পড়ে এবং রোগ সেরে যায়।

খারাপ অভ্যাস

প্রায় সকল দেশেই কতকগুলো খারাপ অভ্যাসের খুব চলন দেখা যায়। এই খারাপ অভ্যাসগুলোকে বলে কুসংস্কার। এই কুসংস্কারগুলো মানুষের খুবই অনিষ্ট করে। তাই এগুলো দূর করতে না পারলে জাতির মংগল নেই।

আমাদের দেশে এই কুসংস্কারগুলো খুব বেশী দেখা যায়। আমাদের উঠা-বসা, চলা-ফেরা, খাওয়া-শোওয়া, সবকিছুতেই কুসংস্কার জড়িয়ে আছে। এগুলোর জন্য নানারকম রোগ আমাদের মধ্যে সহজেই ছড়িয়ে পড়ার সুবিধা পায়। কাজেই এগুলো দূর করা খুবই দরকার।

অনেক ছেলেমেয়ে এমন কি বড়দের মধ্যেও দেখা যায় যে তারা থুথু লাগিয়ে খাতা বা বইয়ের পাতা উল্টোয়। পেন্সিলের শীষে থুথু দিয়ে লেখে, থুথু দিয়ে ডাকটিকিট লাগায় ইত্যাদি। ছেলেমেয়েদের দেখা যায় থুথু দিয়ে সিলেট মুছতে। এই অভ্যাসগুলো যে খুবই নোংরা তা সহজেই বোঝা যায়। থুথু দিয়ে খাতা বা বইয়ের পাতা উল্টালে রোগের জীবাণু প্রত্যেক পাতায় রেখে দেওয়া হয়। সেই খাতা বা বই অন্য লোকে পড়লে তাদের শরীরে রোগের জীবাণু ঢুকে যেতে পারে। পেন্সিলের শীষ মুখে দিলে বা ডাক টিকিটে থুথু লাগালে একদিকে বাইরের জীবাণু নিজের শরীরে ঢুকতে পারে। আবার নিজের কোন অসুখ থাকলে তার জীবাণু পরের শরীরে ঢুকতে পারে। কাজেই এসব নোংরা অভ্যাস সকলেরই ছাড়া উচিত।

অনেকে কাশ্‌বার সময় ও হাঁচবার সময় অন্যের মুখের কাছে কাশে বা হাঁচে। এর ফলে তার কাশির ও হাঁচির কণা অন্য লোকের নাকে, মুখে লেগে যায়। এভাবে এক জনের শরীরের রোগের জীবাণু অন্যের শরীরে ঢোকায় তারও রোগ হয়। এই অভ্যাস ছাড়া দরকার। কাসবার ও হাঁচবার সময় নাকে ও মুখে রুমাল চাপা দিতে হয়। পরে এই রুমাল গরম জলে কেচে নিতে হয়।

আমাদের দেশের লোকের একটা বড় রকমের নোংরা অভ্যাস হচ্ছে যেখানে সেখানে থুথু ফেলা। তারা বাড়ীতে, ট্রামে, বাসে, ট্রেণে, রাস্তায় কফ ও থুথু ফেলে। ট্রেণের কামরায় বড় বড় করে লেখা থাকে "থুথু ফেলিও না"। কিন্তু তারা সে লেখা দেখেও দেখেনা। এভাবে যেখানে সেখানে থুথু ফেললে আশ-পাশ অকারণে নোংরা হয়। সেখানে দুর্গন্ধ ওঠে। আর সেই গন্ধের জন্যে মাছি এসে সেই কফ, থুথুর উপর বসে। সেই কফ, থুথুর কণা তাদের পায়ে ও ডানায় লেগে যায়; পরে কোন খাবার জিনিষে বসলে তাথেকে খাবার দূষিত হয়। সেই দূষিত খাবার খেয়ে রোগ হয়। আবার কোন কোন লোকের ছোঁয়াচে রোগ থাকতে পারে। তাদের কফ্, থুথুর সংগে অনেক রোগের জীবাণু বের হয়ে আসে। পরে ঐ কফ্, থুথু শুকিয়ে গেলে ঐ জাবাণু ধুলোবালির সংগে মিশে বাতাসে ভেসে বেড়ায় এবং সুস্থ লোক শ্বাস টেনে নেবার সময় ঐ জীবাণু শরীরের ভিতর টেনে নেয়। ফলে তার রোগ হয়। কাজেই নানারকম রোগের হাত থেকে বাঁচতে হলে যেখানে সেখানে থুথু ফেলার অভ্যাস ছাড়া খুবই দরকার। এদেশে বেশির ভাগ গাঁয়েই

খাওয়া বা ব্যবহারের জল পাওয়ার একমাত্র জায়গা হচ্ছে পুকুর। কিন্তু সেই পুকুরের জলে লোকে ময়লা কাপড়-চোপড় কাচে, গরু-মোষ স্নান করায়। নিজেরাও স্নান করে এমন কি রোগীর মল-মূত্র বা বমি মাখা কাপড়-চোপড়ও ধোয়। ফলে পুকুরের জল দূষিত হয়ে উঠে। আবার সেই জল লোকে খায় বা রান্নার কাজে ব্যবহার করে। ফলে রোগ-জীবাণু সহজেই শরীরে ঢুকে রোগ বাধায়! কিন্তু একথা পাড়াগাঁয়ের লোকেরা মানতে চায় না। তাদের মনে একটা বড় রকমের কুসংস্কার আছে। সেটা হচ্ছে যে "জল নারায়ণ!" জলাশয়ের জল দূষিত হতে পারে না। কিন্তু এটা খুবই ভুল। পুকুরের জল নানাভাবে সবসময় দূষিত হবেই। তবে এই দূষিত জলের হাত থেকে বাঁচার উপায়ও আছে। তা হচ্ছে খাবার ও ব্যবহারের জলের পুকুর আলাদা রাখা ও খাবার জল ফুটিয়ে খাওয়া। খাওয়ার সময় বারে বারে জল খাওয়াও খুব খারাপ অভ্যাস। এতে খিদে কমে যায় আর বেশী জল খাওয়ার জন্য হজমের ক্ষমতাও কমে যায়।

খাওয়ার ব্যাপারে আমাদের কতকগুলো কুসংস্কার আছে। সেগুলো হচ্ছে এই যে আমরা রোজ নিয়ম করে খাইনা আর পরের পেলে সাধ্যের বেশী খাবার একদিনে খেয়ে ফেলি। কোন কোন খাবার আমরা ভালভাবে চিবিয়েও খাইনা। এগুলোর কোনটাই ঠিক নয়। রোজ নিয়মমত খাবার খাওয়া দরকার এজন্য যে তাহলে যেমন খিদে হবে ঠিক তেমন খাওয়ার সুযোগ পাওয়া যাবে। ফলে পেটের কোন রোগ হবে না! পাওয়া গেছে বলেই রোজকার চেয়ে বেশী খাবার একদিনে খাওয়া ঠিক

নয়। নিমন্ত্রণ বাড়ীতে গিয়ে লোভে পড়ে বেশী খাওয়া উচিত নয়। এতে পেটের অসুখ এমন কি কলেরাও হতে পারে। হজমের কাজ ঠিক রাখার জন্য প্রত্যেক খাবার ভালমত চিবিয়ে খেতে হয়।

মাংস খাওয়া শরীরের পক্‌খে ভাল। কিনতু আমরা নিয়মিত মাংস না খেয়ে মাঝে মাঝে বেশী পরিমাণে খাই। তাতে শরীরের ক্ষতিই হয়। রোজ নিয়মিত খেলে শরীরের যে উপকার হত তা হয় না। কারণ এতে হজমের গোলমাল হয়ে থাকে।

খাওয়ার সময় একজনের এঁটো থালায় অন্যজনকে খেতে দেওয়া ঠিক নয়। কারণ একজনের শরীরে হয়ত রোগের জীবাণু থাকতে পারে, তা এই এঁটো থালায় খাওয়ার জন্য অন্যের শরীরে ঢোকার সুযোগ পাবে। কিন্তু আমাদের মধ্যে এই এঁটো থালায় খাওয়ানোর অভ্যাস খুব চলতি। এদেশে রীতি হচ্‌ছে বড়র এঁটো পাতে ছোটরা খাবে, ছোটদের কেউ যদি এভাবে খেতে রাজী না হয় তাহলে তোকে খাওয়ানোর জন্য জুলুম করা হয়। এটা খুবই খারাপ। এভাবে রোগ যতটা ছড়িয়ে পড়তে পারে ততটা আর কিছুতেই নয়। একজনের মাখা বা এঁটো ভাত ইত্যাদি তো কোনোমতেই অন্যকে খাওয়ানো উচিত নয়।

শোবার ব্যাপারেও আমাদের কুসংস্কার আছে। এদেশে সকলে মিলে এক ঘরে শোবার রীতি দেখা যায়। আবার সকলে বিশেষ করে ছোট ছেলেমেয়েরা এক বিছানায় শোয়। এটা খুব খারাপ। কারণ এতে কারো শরীরে কোন রোগ থাকলে তা এভাবে শোয়ার জন্য শ্বাসের সংগে ও ছোঁয়া-ছুয়িতেও অন্যের

শরীরে সহজে ঢুকে যেতে পারে। সম্ভব হলে সকলের জন্য আলাদা বিছানার ব্যবস্থা করা দরকার। পারলে পরে প্রত্যেককে আলাদা ঘরে শুতে দেওয়া উচিত। মশার কামড় থেকেও এক দেহের জীবাণু অন্য দেহে যায়। এজন্য প্রত্যেকেরই মশারি টাঙিয়ে শোওয়া উচিত। ঘরের জানলা বন্ধ করে কি কাপড় বা চাদরে আগাগোড়া মুড়ি দিয়ে শোবার যে রীতি তাও ঠিক নয়। কারণ জানলা বন্ধ রাখলে ঘরে বাতাস চলাচল করতে পায় না। শীতকালে অন্ততঃ একটি জানলা খুলে রাখা উচিত। আর কাপড়-বা-চাদর মুড়ি দিয়ে শুলে শ্বাসের কাজ ঠিকমত চলে না। কুঁক্‌ড়ি হয়ে শোয়া ঠিক নয়। কারণ এতে শরীরের সব যায়গায় রক্ত চলাচল করতে পায় না। সব সময় সোজা হয়ে শোওয়া ভাল। তেমনি বসাও উচিত সোজা হয়ে। শির্‌দাঁড়া বাঁকিয়ে বসলে শরীরে রক্ত চলাচল তো ভালভাবে হয়ই না আবার বেশী দিন এভাবে বসলে শিরদাঁড়া বেঁকে গিয়ে কুঁজো হয়ে যাওয়াও সম্ভব।

পাড়াগাঁয়ের অনেক লোকের মনে একটা ধারণা আছে যে স্নান করার পর চুল আঁচড়ান বা টেরিকাটা বিলাসিতা। এজন্য অনেকেই স্নান করে চুল আঁচড়ায় না। পাড়াগাঁয়ের ছোট ছোট ছেলেমেয়ের মধ্যে সাধারণতঃ এই অভ্যাস দেখা যায়। এতে মাথায় ময়লা জমে, খুস্‌কি হয় এবং অনেক সময় উকুন হয়। শরীর ভাল রাখতে হলে নিয়মিত চুল আঁচড়ান দরকার। আবার অনেক বাড়ীতে দেখা যায় একখানা চিরুণীতেই বাড়ীর সকল লোক এমন কি বাইরের অতিথিও চুল আঁচড়ায়। এই অভ্যাসও খারাপ। কম দামের চিরুণী প্রত্যেকের জন্য একটা করে রাখা উচিত।

পাড়াগাঁয়ের ও শহরের অনেক ছেলেমেয়ের মধ্যে আঙুল চোষা ও দাঁত দিয়ে আঙুলের নখ্ কাটার অভ্যাস দেখা যায়। এও খুবই খারাপ। এতে আঙুলের ও নখের ভিতরকার ময়লা সহজেই পেটে যেতে পারে। এ অভ্যাস ছাড়ান দরকার।

অনেক বাড়ীতে দেখা যায় বাড়ীর সকল লোকে এক গামছায় গা মোছে। এটা খুব খারাপ। কারণ বাড়ীর কারও হয়ত খোস, পাঁচড়া, দাদ প্রভৃতি চর্মরোগ থাকতে পারে। গামছায় গা মুছলে ঐ সব রোগের জীবাণু বোঝাই ঘায়ের পুঁজ, রক্ত, ও খোসা ইত্যাদি গামছায় লেগে যায়। পরে সুস্থ লোক ঐ গামছায় গা মুছলে ঐ জীবাণু তার দেহেও লেগে যায় এবং রোগের সৃষ্টি করে। কাজেই চর্মরোগের হাত থেকে বাঁচবার উপায় হল প্রত্যেকের জন্য আলাদা আলাদা গামছার ব্যবস্থা করা। তবে অনেকে হয়ত বলবেন বাড়ীর প্রত্যেকের জন্য আলাদা আলাদা গামছার ব্যবস্থা করা বাড়ীর মালিকের পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ এতে খরচ অনেক পড়বে। কিন্তু তিনি একটু ভেবে দেখলেই বুঝতে পারবেন এতে প্রথমে খরচ একটু বেশী পড়বে ঠিক ; কিন্তু পরে সে খরচ ঠিক পুষিয়ে যাবে। কারণ একটা গামছায় সকলে গা মুছলে খুব তাড়াতাড়ি গামছা ছিঁড়ে যায়। একটা কেনার অল্প দিন পরেই আর একটা কেনার দরকার হয়। কিন্তু প্রত্যেকে আলাদা আলাদা গামছা ব্যবহার করলে সেগুলি অনেকদিন যাবে। কাজেই একবার কেনার সময় খরচ একটু বেশী পড়বে কিন্তু তারপরে আর অনেকদিন কিনতে হবে না।

গামছার মতই একজনের জামা-কাপড় ইত্যাদি অন্যের ব্যবহার করা ঠিক নয়। এতে এক জনের শরীরের রোগের

জীবাণু অন্যের শরীরে ঢুকবার পথ পায়। আবার এতে পাঁচজনে এক জিনিষ ব্যবহার করায় জিনিষ ছেঁড়েও তাড়াতাড়ি। কাজেই খরচ কম করা ও রোগের হাত থেকে রেহাই পাওয়া এই দু' কারণেই প্রত্যেকের ব্যবহারের জিনিষ আলাদা রাখা দরকার।

দাঁত মাজার বুরুশ দিয়ে দাঁত মাজার চলন আজকাল অনেক বাড়ীতে দেখা যায়। কিন্তু সব বাড়ীতে হয়ত প্রত্যেকের জন্য আলাদা দাঁত মাজার বুরুশের ব্যবস্থা নাই। বাড়ীর সকলে একটা কি দুটো বুরুশেই পরের পর মাজে। এটা খুব খারাপ অভ্যাস কারণ একজনের হয়ত কোন দাঁতের অসুখ থাকতে পারে। তার জীবাণু বোঝাই পুঁজ, রক্ত বুরুশের গায়ে লেগে যাবে। পরে আর একজন ওতে দাঁত মাজলে তারও দাঁতের গোড়ায় জীবাণু লেগে ঐ রোগ হবে। কাজেই প্রত্যেকের জন্য আলাদা আলাদা দাঁত মাজার বুরুশের ব্যবস্থা করতে হবে। যদি তা না পারা যায় তবে বুরুশে দাঁত না মেজে নিম, কি বাব্‌লার ডালের দাঁতনে দাঁত মাজা ভাল। একজনের জিব্‌-ছোলায় অন্যের জিব্‌-ছোলাও ঠিক নয়।

আমাদের আর একটা খারাপ অভ্যাস হচ্ছে এই যে আমরা কোথাও থেকে বেড়িয়ে এসে ভাল ভাবে হাত-পা-মুখ না ধুয়ে কিছু খেতে বসি। এর কারণ এই হাত-পা-মুখ ধোয়ার কি যে হেতু তা আমরা ঠিক করতে পারি না। এই হাত-পা-মুখ ধোয়ার হেতু আর কিছুই নয়, কেবল জীবাণুর হাত থেকে রেহাই পাওয়া। আমরা যখন বাইরে বেরুই তখন বাতাসের ধুলোবালির ও চারপাশের অনেক রকম জীবাণু আমাদের

শরীরে ও পোষাকে লেগে যায়। আমরা বাড়ী ফিরে যদি হাত-পা-মুখ ভাল ভাবে ধুয়ে ফেলি এবং বাইরের পোষাক ছেড়ে রেখে অন্য পোষাক পরি এবং তারপরে খেতে বসি, তাহলে আর ঐ জীবাণুগুলি আমাদের শরীর ও পোষাক থেকে গিয়ে খাদ্যে মেশেনা। ফলে ঐ খাবার খেয়ে আমাদের রোগ হতে পারে না।

আমাদের দেশে ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা এমন কি অনেক সময় বড় লোকেরাও আম, জাম, লিচু, কলা, জামরুল প্রভৃতি ফল বাজার থেকে কিনে এনে বা গাছের তলা থেকে কুড়িয়ে এনে না ধুয়ে খেতে আরম্ভ করে। বাজারের বা মাটিতে পড়ে থাকা জিনিষ পোটাসিয়াম্ মিশান জলে ধোয়া উচিত। পোটাসিয়াম্ মেশান জল না থাকলে সাধারণ জলে ধুয়ে নিলেও চলবে। এতে রোগের জীবাণু ফলের সংগে আমাদের শরীরে ঢুকতে পারবে না।

খাবার না ঢেকে রাখাও খুবই খারাপ। এভাবে রাখলে পরে, খাবারে মাছি ইত্যাদি বসে খাবারকে দূষিত করে। কিন্তু এদেশের লোক হয়ত এর দোষ ঠিক ধরতে পারে না, তাই তারা খাবার আঢাকা রাখে। এটা ঠিক নয়। এই আঢাকা খাবার খেয়ে নানা রোগ হতে পারে।

বাংলা দেশে আমরা তরকারী রান্না করি বেশী করে তেল, মশলা দিয়ে। এতে খাবার খেতে ভাল হয় বটে কিন্তু খাদ্য-বস্তুর সার বস্তু এতে নষ্ট হয়ে যায়। আমরা ভাত রান্না করে ফেন ফেলে দিই, এতে ভাতের সার বস্তু চলে যায়। ভাত রান্না করার সময় মাপ করে জল দেওয়া উচিত

যাতে ফেন ফেলতে না হয়। কাঁচা তরকারির খোসা ছাড়ান আমাদের অভ্যাস। কিন্তু খোসার নীচেই থাকে তরকারির ভিটামিন। কাজেই কাঁচা তরকারির খোসা না ছাড়িয়ে সিদ্ধ করার পর খোসা ছাড়ালে আমরা তরকারীর সার-বস্তু গ্রহণ করতে পারি।

পাড়াগাঁয়ে প্রায় সব বাড়ীতেই গরু আছে। কিন্তু বেশীর ভাগ বাড়ীতেই দেখা যায় শোবার ঘর বা রান্না ঘরের পাশেই থাকে গোয়াল ঘর। গরুর মল-মূত্র পরিষ্কার না করার জন্য একটা দুর্গন্ধ উঠে এবং রোগের জীবাণু জন্মে। গোয়াল শোবার ও খাবার ঘর হতে দূরে হওয়া উচিত।
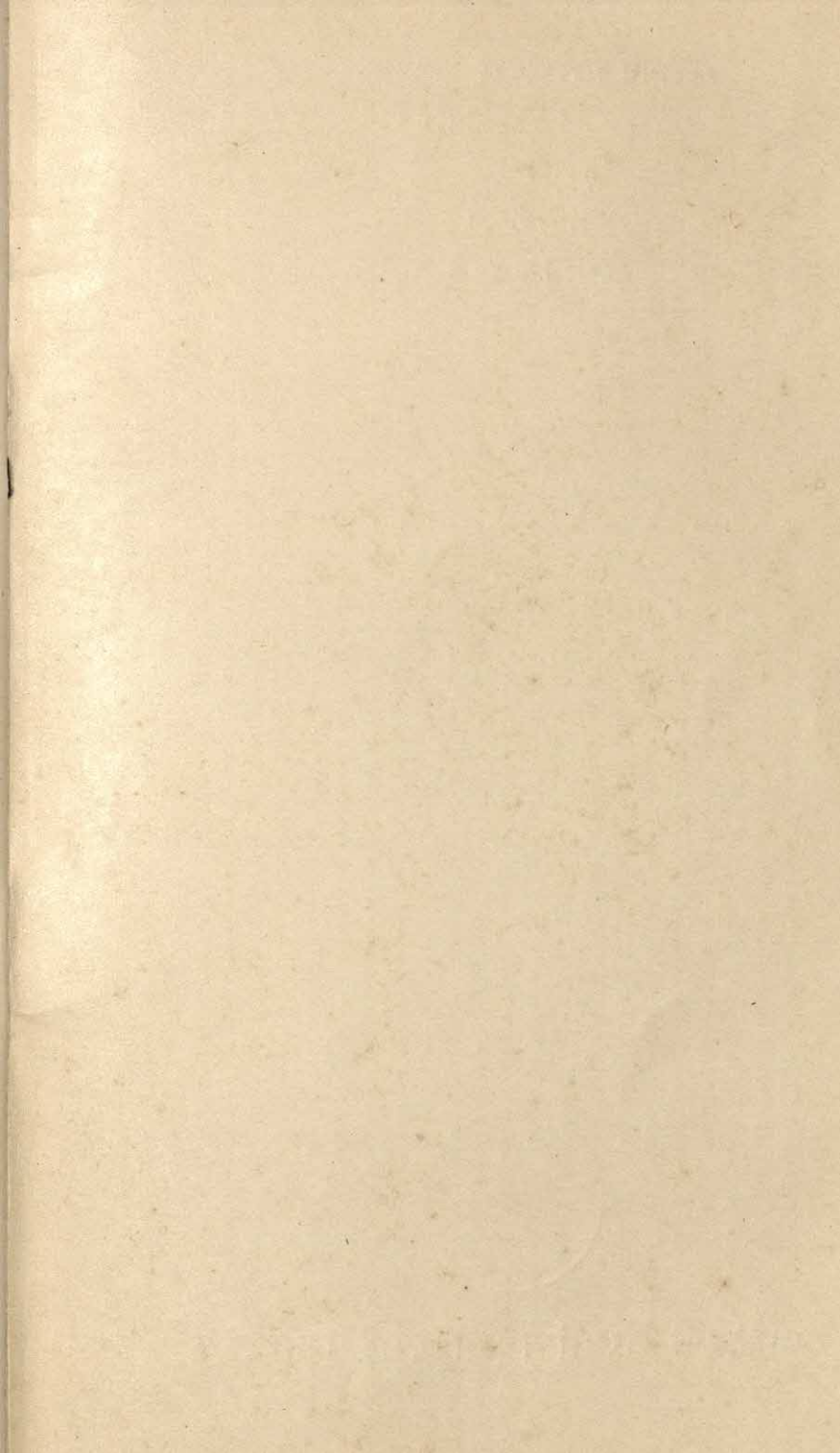
সহজবোধ্য কয়েকখানি বই

শরীর ভাল রাখতে হলে

পুরাণ-কথা

গ্রামের সমাজ

মোরগ ও মুরগী

ওরিয়েণ্ট লংম্যান্স প্রাইভেট লিমিটেড